শ্যামল ছায়া

হুমায়ূন আহমেদ

সূচিপত্র

আবু জাফর শামসুদ্দিন 2

হুমায়ূন আহমেদ 19

হাসান আলি 33

আবদুল মজিদ 38

আনিস সাবেত 50

আবু জাফর শামসুদ্দিন

ভূমিকা

আমার বাবা পুলিশ অফিসার ছিলেন। উনিস শ একাত্তর সনের পাঁচই মে তাঁকে দেশপ্রেমের অপরাধে পাক আর্মি গুলী করে হত্যা করে। সে সময় আমি আমার ছোট ছোট ভাইবোনদের নিয়ে বরিশালের এক গ্রামে লুকিয়ে আছি। কী দুঃসহ দিনই না গিয়েছে! বুকের ভেতর কিলবিল করছে ঘৃণা, লকলক করছে প্রতিশোধের আগুন। স্বাধীনতাটাধীনতা কিছু নয়, শুধু ভেবেছি, যদি একবার রাইফেলের কালো নলের সামনে ওদের দাঁড় করাতে পারতাম। ঠিক একই রকম ঘৃণা, প্রতিশোধ গ্রহণের একই রকম তীব্র আকাঙক্ষণ সেই অন্ধকার দিনের অসংখ্য ছেলেকে দুঃসাহসী করে তুলেছিল। তাদের যুদ্ধের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না, কোনো সহায় সম্বল ছিল না, কিন্তু শ্যামল ছায়ার জন্যে গাঢ় ভালোবাসা ছিল। আমার শ্যামল ছায়া সেই সব বন্ধুদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য।

— হুমায়ূন আহমেদ

০১. আবু জাফর শামসুদ্দিন

নৌকা ছাড়তেই ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়তে লাগল।

এ অঞ্চলে বৃষ্টি-বাদলার কিছু ঠিক নেই। কখন যে হুঁড়মুড়িয়ে বৃষ্টি নামবে, আবার কখন যে সব মেঘ কেটে গিয়ে আকাশ ঝকঝকে হয়ে উঠবে, কেউ বলতে পারে না।

আমি নৌকার ভেতরে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়লাম। বেশ শীত করছে। ঠাণ্ডা বাতাসে গায়ে কাপন লাগে। নৌকা চলছে মন্থর গতিতে। হাসান আলি নির্বিকার ভঙ্গিতে দাঁড় টানছে। এত বড়ো নৌকা কী জন্যে নিয়েছে কে বলবে। পানসির মতো আকৃতি। দাঁড় টেনে একে নিয়ে যাওয়া কি সোজা কথা?

এখন বাজছে নটা। রাত দুটোর আগে রামদিয়া পৌঁছান এ নৌকার কর্ম নয়। গুণ টেনে নিয়ে গেলে হয়তো হবে। কিন্তু গুণটা টানবে কে? আমি নেই এর মধ্যে, ভিজে গুণের দড়ি নিয়ে দৌড়ান। আমাকে দিয়ে হবে না। সাফ কথা।

বৃষ্টি দেখছি ক্রমেই বাড়ছে। বিলের মধ্যিখানে বৃষ্টির শব্দটা এমন অদ্ভুত লাগে। কেমন যেন মন খারাপ হয়ে যায়। মাঝে মাঝে আবার বাতাসে হিত হিত আওয়াজ উঠছে। প্যাচা ডাকার মতো। ভয় ধরে যায় শব্দ শুনে। ছেলেবেলায় এক বার এরকম শব্দ শুনে এমন ভয় পেয়েছিলাম। মানসাপোতার বিলে মাঝি দিক ভুল করেছে। চারদিকে সীমাহীন জল। বড়োরা সবাই ভয় পেয়ে চেঁচামেচি করছে। তাদের হৈচৈ-এ ঘুম ভেঙে শুনেছি সেই বিচিত্র হত্ত হত্ত আওয়াজ। আজও সেই শব্দে ভয় ধরল। কে জানে কেন। আমি কি কোনো অমঙ্গলের আশঙ্কা করছ?

কুটকুট করে মশার কামড় খাচ্ছি। এই বিলের মধ্যে আবার মশা কোথেকে আসে? হাত-পা আর মুখে অল্প কিছু কেরোসিন তেল মেখে নিলে হত। সবাই দেখি তাই করে। হুমায়ূন ভাইও করেন। মশার উৎপাত থেকে বাঁচা যায় তাহলে। কেরোসিন মাখতে ইচ্ছে হয় না। আমার। কি জানি বাবা চামড়ার কোনো ক্ষতিই করে। কিনা। হয়তো গাল-টাল কলসে কয়লা হয়ে পড়বে। এর চেয়ে মশার কামড় অনেক ভালো। হাণ্ডেড টাইমস বেটার।

হুমায়ূন ভাইও দেখি আমার পাশে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছেন। তাঁর ধারণা, আমি ঘুমিয়ে রয়েছি। মাথার নিচে থেকে নিঃশব্দে বালিশটা নিয়ে নিলেন। বেশ লোক যা হোক! মজিদ বা আনিস হলে আমি গদাম করে একটা ঘুষি মারতাম। পরিষ্কার একটা হাতের কাজ দেখতে পেত। চালাকি পেয়েছ, না? বালিশ ছাড়া আমি শুয়ে থাকতে পারি না। অনেকেরই দেখি মাথার নিচে কিছু নেই, কিন্তু কেমন ভোঁস ভোঁস করে নাক ডাকায়। আমি পারি না।

বৃষ্টির তো বড়ো বাড়াবাড়ি দেখছি। ঝড়টড় এলে বিপদ। সাঁতার যা জানি, তাতে তিন মিনিটের বেশি ভেসে থাকা যাবে না। নৌকা ডুবলে মার্বেলের গুলির মতো তলিয়ে যাওয়া ছাড়া গতি নেই। অবশ্যি সেটাও খুব একটা মন্দ ব্যাপার হবে না। ওমা, হাসি আসছে কি জন্যে বা! সবাইকে চমকে দিয়ে হেসে উঠব নাকি?

হুমায়ূন ভাই দেখি উঠে বসেছেন। মশা কামড়াচ্ছে বোধ হয়। কিংবা কোনো কারণে ভয় লাগছে। ভয় পেলেই এ রকম অস্থিরতা আসে। মজিদ বলল, কি হুমায়ূন ভাই, ঘুম হল না?

এই ঝড়-বৃষ্টিতে ঘুম আসে নাকি? তাছাড়া টেনশনের সময় আমার ঘুম হয় না।

এক দফা চা খেলে কেমন হয়? বানাব নাকি?

বাতাসের মধ্যে চুলা ধরাবে কী করে?

হাসান মিয়া ধরাতে পারবে। ও হাসা, লাগি মেরে নৌকা দাঁড় করাও গো। চা না খেলে জুত হচ্ছে না। এহা-হে, তুমি তো ভিজে একেবারে আলুর দাম হয়ে গেছ হাসান আলি।

ভিজে আলুর দাম হয়ে যাওয়াটা আবার কী রকম! এরকম উল্টোপাল্টা কথা শুধু মজিদই বলতে পারে। এক দিন আমাকে এসে বলছে, জাফর, যা পরিশ্রম করেছি–একেবারে টমেটো হয়ে গেছি। পরিশ্রমের সঙ্গে টমেটোর কী সম্পর্ক কে জানে।

নৌকার খুঁটি গেড়ে বসে আছে। এতক্ষণে তাও নৌকার দুলুনিতে বেশ একটা ঝিমুনির মতো এসেছিল, সেটুকুও গেছে। ঘনঘন চা খেয়ে কী আরাম যে পায় লোকে, কে জানে। আনিস দেখি। আবার সিগারেটও ধরিয়েছে। নতুন খাওয়া শিখেছে। তো, তাই যখন-তখন সিগারেট ধরান চাই। আবার ধোঁয়া ছাড়ার কত রকম কায়দা। নাক-মুখ দিয়ে। হাসি লাগে দেখে। মজিদ বলল, আনিস, আমাকে একটা ট্রাফিক পুলিশ দাও দেখি। আরে বাবা, সিগারেটের কথা বলছি।

বুঝেছি। বুঝেছি, তোমার এইসব ঢং ছাড় দেখি।

বৃষ্টির বেগ মনে হয় একটু কমেছে। হা-হা করে বাতাস বইছে ঠিকই। মজিদ বলল, জাফর মড়ার মতো ঘুমুচ্ছে, দেখেছেন হুমায়ূন ভাই!

হেঁটে অভ্যেস নেই তো, টায়ার্ড হয়ে পড়েছে।

টায়ার্ড না হাতি, জাফর হচ্ছে কুম্ভকর্ণের ভাতিজা। হেভি ফাইটিং-এর সময়ও দেখবেন মেশিনগানের ওপর মাথা রেখে ঘুমুচ্ছে।

সবাই হেসে উঠল হো-হো করে। আমার বেশ মজা লাগছে। আনিস বলল, এক কাজ করি, জাফরের কানের কাছে মুখ নিয়ে মিলিটারি মিলিটারি বলে চিৎকার করে উঠি। দেখি জাফর কী করে। মজিদ বলল, দাঁড়া, চায়ের পানি ফুটুক, তারপর।

ওদের কথাবার্তা এমন ছেলেমানুষী, হাসি লাগে আমার। কী মনে করেছে। ওরা। মিলিটারি মিলিটারি শুনে আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে আমি পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ব নাকি? সরি, এতটা ভয় আমার নেই। আচমকা শুনলে একটু দিশাহারা হব হয়তো, এর বেশি না। সোনাতলায় এক বার মিলিটারির সামনে পড়ে গেলাম না? আমি আর সতীশ ধানক্ষেতে রাইফেল লুকিয়ে একটু এগিয়েছি, অমনি মুখোমুখি। ভাগ্য ভালো-দলের আর কেউ ছিল না। আমাদের সঙ্গে। আট-দশটা জোয়ান ছেলে একসঙ্গে দেখলে কি আর রক্ষা ছিল? দু জন ছিলাম বলেই বেঁচেছি। সতীশ অবশ্যি দারুণ ভয় পেয়েছিল। নারকেলের পাতার মতো কাঁপতে শুরু করেছে। আমি নিজেও হকচকিয়ে গিয়েছি। ছ জন মিলিটারি ছিল সব মিলিয়ে, যেমন চেহারা তেমন স্বাস্থ্য। তারা জানতে চাইল, কোন বাড়িতে কচি ডাব পাওয়া যাবে। আমরা ওদের খাতির করে আজিজ মল্লিকের বাড়ি নিয়ে গেলাম। সতীশ গাছে উঠে কাদি কাদি ডাব পেড়ে নামাল। তারা মহাখুশি। এক টাকার একটা নোট দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে দিল সতীশের দিকে। সতীশ সেই নোট হাতে নিয়ে বত্রিশ দাঁতে হেসে ফেলল--যেন সাত রাজার ধন হাতে পেয়েছে।

প্ল্যান করেছিলাম, রাতের অন্ধকারে এক হাত নেব। কিন্তু ওরা সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকল না। দুপুরের রোদ একটু কমতেই রওনা হয়ে গেল।

বৃষ্টি বোধ করি একেবারেই থেমে গেল। চা বানান হচ্ছে শুনছি। ওদের মিলিটারি মিলিটারি বলে চেঁচিয়ে ওঠার আগেই উঠে পড়ব। কিনা ভাবছি, তখনি অনেক দূরে কোথায় হই হই শব্দ পাওয়া গেল। নিমিষের মধ্যে আমাদের নৌকার সাড়া-শব্দ বন্ধ। চায়ের পানি ফোটার বিজ বিজ আওয়াজ ছাড়া অন্য কোনো আওয়াজ নেই। হাসান বলল, নৌকা আসন্তাছে। একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল শরীরে। ধ্বক করে উঠল বুক।

কিসের নৌকা, কাদের নৌকা-কে জানে? মিলিটারিরা অবশ্যি স্পীডবোট ছাড়া নড়াচড়া করে না। তা ছাড়া রাতের বেলা তারা ঘাঁটি ছেড়ে খুব প্রয়োজন ছাড়া নড়ে না। তবে রাজাকারের উপদ্রব বেড়েছে। তাদের আসল উদ্দেশ্য লুটপাট করা। এই পথে শরণার্থীদের নৌকা মেঘালয়ের দিকে যায়। সে সব নৌকায় হামলা করলে টাকা-পয়সা গয়না-টয়না পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে অল্পবয়সী সুশ্রী মেয়েও পাওয়া যায়। দূরের নৌকা দেখলাম স্পষ্ট হয়েছে। সেখান থেকে ভয় পাওয়া গলায় কে যেন হাক দিল, কার নৌকা গো?

আমাদের নৌকা থেকে মজিদ চেঁচিয়ে বলল, তোমার কার নৌক?

ব্যাপারীর নৌকা। মাছ যায়।

শুনে পেটের মধ্যে হাসির বুদবুদি ওঠে। ব্যাপারী মাছের চালান দেয়ার আর সময় পেল না। আর মাছ নিয়ে যাচ্ছে এমন জায়গায়, যেখানে দেড় টাকায় একএকটা মাঝারি সাইজের রুক্তই পাওয়া যায়। হুমায়ূন ভাইয়ের গম্ভীর গলা শোনা গেল, এই যে মাছের ব্যাপারী, নৌকা আন এদিকে।

কী আশ্চর্য, এই কথাতেই নৌকার ভেতর থেকে বহুকণ্ঠের কান্না শুরু হয়ে গেল! ছোট ছোট ছেলেমেয়ের গলার আওয়াজও আছে। এই বাচ্চাগুলি এতক্ষণ কী করে চুপ করে ছিল তাই ভাবি। নৌকার ভেতর থেকে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। মজিদ বলল, ভয় নাই ব্যাপারী, নৌকা কাছে আন।

আপনারা কী করেন?

ভয় নাই, আমরা মুক্তিবাহিনীর লোক। আস এদিকে, কিছু খবর নেই।

মুক্তিবাহিনী, মুক্তিবাহিনী! আনন্দের একটা হাল্লা। উঠল। নৌকা দুটিতে। অনেক কৌতূহলী মুখ উঁকি মারল। এরা হয়তো আগে কখনো মুক্তিবাহিনী দেখে নি, শুধু নাম শুনেছে। মেঘ কেটে গিয়ে আকাশে চাঁদ উঠেছে। চাঁদের আলোয় কৌতূহলী মুখগুলি দেখতে ভালো লাগে।

নমস্কার গো বাবাসকল। আমার নাম হরি পাল। কাসুন্দিয়ার জগৎ পালের নাম তো জানেন। আমি জগৎ পালের ছোট ভাই। আমার আর জ্যাঠার পরিবার আছে। এই নৌকায়। মোট একুশ জন।

হরি পাল লোকটা বাক্যবাগীশ। কথা বলেই যেতে লাগল। দেখতে পাচ্ছি, তার ঘনঘন তৃপ্তির নিঃশ্বাস পড়ছে। নৌকার ভেতরের ছেলেমেয়েগুলির কৌতূহলের সীমা নেই। ক্রমাগত উঁকিঝুকি দিচ্ছে। এদের মধ্যে একটি মেয়ের চেহারা এমন মনকাড়া যে চোখ ফেরান যায় না। আমি বললাম, ও খুকি, কী নাম তোমার?

খুকি জবাব দেবার আগেই হরি পাল বলল, এর ডাকনাম মালতী। ভালো নাম সরোজিনী। আর এর বড়ো যে, তার নাম লক্ষ্মী। ভালো নাম কমলা। ও মালতী, বাবুরে নমস্কার দে। মালতী ফিক করে হেসে ফেলল। হরি পালকে চা খেতে দেওয়া হল এক কাপ। এত তৃপ্তি করে সে বোধ হয় বহু দিন চা খায় নি। খাওয়া শেষে ভোঁস ভোঁস করে কেঁদে ফেলল। তাদের কাছে আমাদের একটিমাত্র জিজ্ঞাসা ছিল–শিয়ালজানী খালে কোনো নৌকা বাঁধা দেখেছে। কিনা। আমাদের একটি দল সেখানে থাকার কথা। কিন্তু হরি পাল বা হরি পালের মাঝি, কেউই সে-কথা বলতে পারল না।

হাসান আলি নৌকা ছেড়ে দিল। ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে দাঁড় পড়ছে। হরি পালদের নৌকাকে পেছনে ফেলে এগচ্ছি, হঠাৎ শুনলাম ইনিয়েবিনিয়ে সে–নৌকা থেকে কে একটি মেয়ে কাঁদছে। হয়তো তার স্বামী নিখোঁজ হয়েছে, হয়তো তার ছেলেটিকে বেঁধে নিয়ে গেছে রাজাকাররা। নিস্তব্ধ দিগন্ত, বিস্তৃত জলরাশি, আকাশে পরিষ্কার চাঁদ-এ সবের সঙ্গে এই করুণ কান্না কিছুতেই মেলান যায় না। শুধু শুধু মন খারাপ হয়ে যায়।

এগারটা বেজে গেছে। দুটোর আগে রামদিয়া পৌঁছান অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছে। অবশ্যি তা নিয়ে কাউকে খুব চিন্তিতও মনে হচ্ছে না। আনিস দেখি আরেকটা সিগারেট ধরিয়েছে। মজিদ লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে। হাসান আলি নির্বিকার ভঙ্গিতে দাঁড় টানছে। আমি বললাম, হাসান আলি, দুটোর মধ্যে পৌঁছতে পারব তো?

হাসান আলি জবাব দিল না। বিশ্রী স্বভাব তার। কিছু জিজ্ঞেস করলে ভান করবে যেন শুনতে পায় নি। যখন মনে করবে। জবাব দেওয়া প্রয়োজন, তখনি জবাব দেবে, তার

আগে নয়। আমি আবার বললাম, কী মনে হয়। হাসান আলি, দুটোর মধ্যে রামদিয়া পৌঁছব?

কোনো সাড়াশব্দ নেই। এই জাতীয় লোক নিয়ে চলাফেরা করা মুশকিল। আমি তো সহ্যও করতে পারি না। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় দিই রাইফেলের বাঁট দিয়ে মাথায় এক বাড়ি-হারামজাদা ছোটলোক! কিন্তু রাগ সামলাতে হয়। কারণ লোকটা দারুণ কাজের। এ অঞ্চলটা তার নিখাদপণে। নিকষ অন্ধকারে মাঝে মাঝে আমাদের এত সহজে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়েছে যে, মনে হয়েছে ব্যাটা বিড়ালের মতো অন্ধকারেও দেখতে পায়। খাটতে পারে যন্ত্রের মতো। সারা রাত নৌকা চালিয়ে কিছুমাত্র ক্লান্ত না হয়ে বিশ-ত্রিশ মাইল হেঁটে মেরে দিতে পারে। আবু ভাই হাসান আলির কথা উঠলেই বলতেন, দি জায়েন্ট।

কিন্তু এই এক তোষ, মুখ খুলবে না। কিছু জিজ্ঞেস করলে শূন্যদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে আবার নিজের কাজ করে যাবে। প্রথম প্রথম মনে হত হয়তো কানে কম শোনে। ও আল্লা, শেষে দেখি এক মাইল দূরের ঝিঝি পোকার ডাকটিও বুঝি তার কান এড়ায় না। কুড়ালখালির কাছে এক বার-আমাদের সমস্ত দলটি নৌকায় বসে! আবু ভাই সে-সময় বেঁচে। তিনি এক ন্যাংটো বাবার গল্প করছেন, আমরা স্বাই হো-হো করে হাসছি। এমন সময় হাসান আলি বলল, লঞ্চ আসতাছে, উঠেন সবাই পাড়ে উঠেন।

আমরা কান পেতে আছি। কোথায় কী-বাতাসের হুঁস হুঁস শব্দ ছাড়া কোনো শব্দ নেই। আনিস বলল, যত সব বোগাস! তারপর কী কী হল? আবু ভাই ললেন, গল্প পরে হবে, এখন উঠে পড় দেখি; হাসান আলি যখন শব্দ শুনেছে, তখন আর ভুল নেই।

সেবার সত্যি সত্যি দুটি স্পীডবোট বাজারে এসে ভিড়েছিল। হাসান আলির কথা না শুনলে গোটা দলটো মারা পড়তাম।

আমার অবশ্যি সে রকম মৃত্যুভয় নেই। তবু কে আর বেঘোরে মরতে চায়? আমাদের মধ্যে মজিদের ভয়াটাই বোধহয় সবচেয়ে বেশি। কোনো অপারেশনে যাওয়ার আগে কুরআন শরীফ চুমু খাওয়া, নফল নামাজ পড়া, ডান পা আগে ফেলা–এক শ পদের ফ্যাকরা। গলায় ছোটখাটো ঢোলের আকারের এক তাবিজ। কোন পীর সাহেবের দেওয়া, যা সঙ্গে থাকলে অপঘাতে মরবার বিন্দুমাত্র আশঙ্কাও নেই। ভাবলেই হাসি পায়।

এ-রকম ছেলে দলে নেওয়া ঠিক নয়। এতে অন্যদের মনের বল কমে যায়। তবে হ্যাঁ, আমি এক শ বার স্বীকার করি, অপারেশন যখন শুরু হয় তখন মজিদের মাথা থাকে সবচেয়ে ঠাণ্ডা। এক তিল বেতাল নেই। আর এইম পেয়েছে কি, তিনটি গুলীর মধ্যে তার দুটি গুলী যে টার্গেটে লাগবে এ নিয়ে আমি হাজার টাকা বাজি রাখতে পারি। আমাদের টেনিং দেওয়াতেন ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সুবেদার সুরুজ মিয়া। আমরা ডাকতাম বুড়া ওস্তাদ। বুড়া ওস্তাদ প্রায়ই বলতেন, মজিদ ভাইয়ের হাত সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেব। আহু কী হাত–কী নিশানা, জিতা রাহ।

মজিদের মতো ছেলের এতটা ভয় থাকা কি ঠিক? মজিদ। যদি এ-রকম ভয় পায় তো আমরা কী করি? এক রাত্রে ঘুম ভেঙে দেখি সে হাউমাউ করে কাঁদছে। আমি হতভম্ব। জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে মজিদ?

কিছু হয় নাই।

খুব করে চেপে ধরায় বলল, সে স্বপ্নে দেখেছে এক বুড়ো লোক এসে তাকে বলছে–আব্দুল মজিদ, তোমার গলায় কি গুলী লেগেছে? এতেই কান্না। শুনে এমন রাগ ধরল। আমার। ছিঃ ছিঃ এ কী ছেলেমানুষী ব্যাপার! আমি অবশ্যি কাউকে বলি নি।

পরবর্তী এক সপ্তাহ সে কোথাও বেরল না। হেন-তেন কত অজুহাত। আসল কারণ জানি শুধু আমি। কত বোঝালাম–স্বপ্ন তো আর কিছুই নয়, অবচেতন নের চিন্তাই স্বপ্ন হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু মজিদের এক কথা।–তার সব স্বপ্ন নাকি ফলে যায়। এক বার নাকি সে স্বপ্নে দেখিছিল তার ছোট বোন পানি পানি করে চিৎকার করছে, আর সেই বোনটি নাকি ক দিন পরই অ্যাক্সিডিন্টে মারা গেছে। মরবার সময় পানি পানি করে অবিকল যেমন স্বপ্নে দেখেছিল। তেমনি ভঙ্গিতে চেঁচিয়েছে। কী অদ্ভুত যুক্তি!

মৃত্যুর জন্যে ভয় পাওয়াটা একটি ছেলেমানুষী ব্যাপার নয় কি? আমার তাই মনে হয়। যখন সত্যি সত্যি মৃত্যু তার শীতল হাত বাড়াবে, তখন কী করব জানি না, তবে খুব যে একটা বিচলিত হব, তাও মনে হয় না।

তা ছাড়া আমার মৃত্যুতে কারো কিছু আসবে–যাবে না। আমার জন্যে শোক করবার মতো প্রিয়জন কেউ নেশ। লীয়-স্বজনরা চোখের পানি ফেলবে, চেঁচিয়ে কাঁদবে, বন্ধু-বান্ধবরা মুখ কালে; করে বেড়াবে, তবেই না মরে সুখ।

শুনেছি বিলেতে নাকি অনেক ধনী বুড়োবুড়ি বিশেষ এক সংস্থার কাছে টাকা রেখে যায়। এইসব বুড়োবুড়ির কোনো আত্মীয়স্বজন নেই। সেই বিশেষ সংস্থাটি বুড়োবুড়ির মৃত্যুর পর লোক ভাড়া করে আনে। অদ্ভুত ব্যবস্থা। সত্যি এ-রকম কিছু আছে, না। শুধুই গালগল্প? আমাদের দেশে এ-রকম থাকলে আমিও আগেভাগেই লাক ভাড়া করে আনতাম। তারা

সুর করে কাঁদতে বসত–ও জাফর, জাফর র, তুমি কোথায় গেলা রে? এই কথা মনে উঠতেই দেখি হাসি পাচ্ছে। আমি সশব্দে হেসে উঠলাম। আনিস বলল, কী হয়েছে, এত হাসি–

এমনি হাসছি।

হঠাৎ হাসান আলি ভয়-পাওয়া গলায় বলল, লঞ্চের আওয়াজ আসে।

আমার বুক ধ্বক করে উঠল। তার মানে হচ্ছে, আমিও ভয় পাচ্ছি। সেই ভয়, যা যুক্তি-তর্ক মানে না, হঠাৎ করে এসে আমাদের অভিভূত করে ফেলে। হুমায়ূন ভাই বললেন, নৌকা ভেড়াও হাসান আলি।

ছপ ছপ দাঁড় পড়ছে। আনিস এবং মজিদ দুজনেই দুটি বৈঠা তুলে নিয়েছে। আমরা এখনো লঞ্চের শব্দ শুনি নি, তবে হাসান আলি যখন শুনেছে, তখন আর ভুল নেই।

সাড়াশব্দ শুনে মজিদের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সে হকচকিয়ে বলল, কী হয়েছে?

আমি বললাম মজিদ, তোমার শ্বশুর সাহেব আসছেন, উঠে বস।

কে শ্বশুর, কার কথা বলছ?

হুমায়ূন ভাই বিরক্ত হয়ে বললেন, তামাশা রাখ, জাফর। হাসান আলি এখনো শুনতে পাচ্ছ?

হাসান আলি অনেকক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর হাসিমুখে বলল, না, আর শবদ পাই না।

খবর পাওয়া গেছে, এই অঞ্চলে কিছু দিন ধরেই একটি স্পীডবোট ঘুরে বেড়াচ্ছে। বর্ষার পানিতে খালবিলগুলি যেই একটু ভরাট হয়েছে, আমনি নামিয়েছে স্পীডবোট। নৌকা করে আমাদের আরো এগিয়ে যাওয়া ঠিক হবে কি না, বুঝতে পারছি না। অবশ্যি রামদিয়া পর্যন্ত কী ভাবে যাব, তা ঠিক করবে। হাসান আলি। আমাদের রাত দুটোর আগে রামদিয়া পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব হচ্ছে তার। হাসান আলি বলল, হাটাপথে যাওন লাগিব। অল্প কিছু প্যাক-কাদা আছে, কিন্তু উপায় সুর কী!

মজিদ বলল, কিয় মাইল পথ?

আট-নয় মাইল।

আমার শেয়ালের মতো খিদে লেগেছে, হাঁটা মুশকিল।

আনিস বলল, শেয়ালের মতো খিদেটা কী রকম জিনিস?

অর্থাৎ মুরগি খেতে ইচ্ছে হচ্ছে।

মজিদ হোহো করে হেসে ফেলল।

নৌকা থেকে বেরিয়ে এসে দেখি চাঁদ ডুবে গেছে। কিন্তু খুব পরিষ্কার আকাশ। অসংখ্য তারা ঝিকমিক করছে। নক্ষত্রের আলোয় আবছাভাবে সব নজরে আসে। আনিস বলল, দশ মাইল হাঁটা সহজ কর্ম না। হুমায়ূন ভাই অনুমতি দিলে আরেক দফা চা হোক, কী বলেন?

বেশ তো, চা চড়াও।

হাসান আলি, আদা আছে তোমার কাছে? একটু আদা–চা হোক, গলাটা খুসখুসি করছে। জাফর, তুমিও খাবে নাকি হাফ কাপ?

না, চা খেলে ঘুম হয় না। আমার।

ঘুমুবার অবসরটা পাচ্ছ কই?

ঘুমুবার অবসর সত্যি নেই। তবু অভ্যেসটা তো আছে। হুমায়ূন ভাই দেখি নৌকার ছাদে উঠে বসেছেন। গুনগুন করছেন নিজ মনে। কোন গানটা টিউন করছেন, কে জানে। ঠিক ধরতে পারছি না। আহে, চমৎকার লাগছে। আড়াল থেকে শুনতে বেশ লাগে। অনুরোধ করতে গেলেই সেরেছে। গাইবেন না কিছুতেই। তাঁর কাছ থেকে গান শোনবার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে, এমন একটা ভাব দেখান যে, তিনি কী করছেন তার দিকে তোমার একটুও নজর নেই। হ্যাঁ, এইবার গান শোনা যাচ্ছে–

শ্যামল ছায়ায় নাই-বা গেলে
না না না নাই-বা গেলে

না না বলবার সময় বেশ কায়দা করে গলা ভাঙছে তো! শুনতে খুব ভালো লাগছে। শান্ত হয়ে আছে বিল। বিলের পানি দেখাচ্ছে কালো আয়নার মতো। কালো আয়নাটা আবার কী? কি জানি কী। তবে কালো আয়নার কথা মনে হয়। আকাশে অসংখ্য তারা উঠেছে।

তারাগুলির জলে ছায়া পড়া উচিত। কী আশ্চর্য, ছায়া পড়ছে না তো! আকাশে যখন খুব তারা ওঠে, তখন নাকি দেশে আকাল আসে। মজিদ বলল, সাংঘাতিক খিদে লেগেছে। খালি পেটে চা খাওয়াটা কি ঠিক?

হুমায়ূন ভাই গান থামিয়ে বললেন, খালি পেটে চা না খেতে চাইলে গোটা দুই ডিগবাজি খেয়ে নাও মজিদ। এ ছাড়া আর কোনো খাদ্যদ্রব্য নেই।

আনিস আবার এই শুনেই ফ্যাফ্যা করে হাসতে শুরু করেছে। এর মধ্যে এত হাসির কী আছে? হুমায়ূন ভাই আবার গুনগুন শুরু করেছেন। তাঁর বোধহয় মন –টন বিশেষ ভালো নেই। কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন না। এমনি তিনি অবশ্যি শুধু! ফুর্তিবাজ ছেলে। আমার উপর রাগ করেছেন কি?

আজ ভোরে তাঁর সঙ্গে আমার খানিকটা মন কষাকষি হয়েছে। বিস্তু আমি অন্যায় কিছু বলি নি। শুধু বলেছি, মেথিকান্দার এ অপারেশনের দায়িত্ব হুঁমায়ূন ভাইয়ের নিয়ে কাজ নেই। এতে কী মনে করেছেন তিনি? তাঁর প্রতি আস্থা মই আমার? তিনি ঠিকই মনে করেছেন। এমন দুর্বল লোকের এ-রকম, এ্যাসাইনমেন্টের নেতৃত্ব পাওয়া ঠিক নয়। কিন্তু আমাদের সাব-সেক্টরে সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড কী মনে করে এটা করলেন কে জানে!

দালাল হাজী মারার ব্যাপারটাই দেখি না কেন। এই লোক কম করে হলেও গোটা ত্রিশেক মানুষ মারিয়েছে। হিন্দুদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে একাকার করেছে। মিলিটারি ক্যাপ্টেনের পিছে পিছে কুকুরের মতো ঘুরে বেড়িয়েছে। সে যখন হলদিয়ার বাজারে ধরা পড়ল আমাদের হাতে, আমি বললাম, গাছের সঙ্গে বেঁধে বেয়োনেট দিয়ে শেষ করে দি। গ্রামের লোকদের একটা শিক্ষা হোক, ভবিষ্যতে আর কেউ দালালী করবার সাহস পাবে না।

হুমায়ূন ভাই মাথা নাড়েন। ক্যাম্পে নিয়ে যেতে চান এ্যারেষ্ট করে। পাগল নাকি! সেই শেষ পর্যন্ত গুলী করে মারতে হল। হুমায়ূন ভাই সেই দৃশ্যও দেখবেন না। তিনি নদীর পাড়ে চুপচাপ বসে রইলেন। আরে বাবা, তুমি তো মেয়েমানুষ নও। নাচতে নেমেছ, এখন আবার ঘোমটা কিসের? You have to be cruel, only to be kind—আবু ভাই বলতেন সব সময়। আহ, মানুষের মতো মানুষ ছিলেন আবু ভাই। আবু ভাইয়ের লাশ নিয়ে যখন আসল, তখন বড্ড ইচ্ছে হচ্ছিল তাঁর পায়ে চুমু খাই। আবু ভাইয়ের মতো মানুষগুলি এত অল্প আয়ু নিয়ে আসে কেন? যুদ্ধ শেষ হলে আবু ভাইয়ের মেয়েটিকে দেখতে যাব। তাকে কোলে নিয়ে বলব–। কী বলব তাকে?

হুমায়ূন ভাই দেখি উত্তেজিত হয়ে নেমে আসছেন। ছাদ থেকে। কী ব্যাপার, মোটর লঞ্চের আলো দেখা যায় নাকি? আনিস চা ছাকতে ছাকতে বলল, কী ব্যাপার হুমায়ূন ভাই?

কিছু না। অনেকগুলি উল্কাপাত হল। একটা তো প্রকাণ্ড!

উল্কাপাত শুনেছি খুব অশুভ ব্যাপার। আমার মা বলতেন অন্য কথা। তিনি নাকি কোথায় শুনেছেন উল্কাপাতের সময় কেউ যদি তার গোপন ইচ্ছাটি সশব্দে বলে ফেলে, তাহলে সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়। এক মজার কাণ্ড হল এক দিন। জ্যামিতি বই হারিয়ে ফেলেছি। সন্ধ্যাবেল বসে আছি বারান্দায়। আকাশের দিকে চোখ। উল্কাপাত হতে দেখলেই বলব, জ্যামিতি বইটা যেন পাই।

কোথায় গেল সে-সব দিন। মায়ের মুখ আর মনেই পড়ে না। এক দিন কথায় কথায় অবনী স্যার আমাদের ক্লাসে বললেন, যে-সব ছেলের মনে মায়ের চেহারার কোনো স্মৃতি নেই, তারা হল সবচে অভাগা। আমি চোখ বুজে ক্লাসের ভেতরেই স্বায়ের চেহারা মনে আনতে

চেষ্টা করলাম। একটুও মনে পড়ল না। সেই যে পড়ল না, পড়লাই না। এখনো পড়ে না। স্বপ্নেও যে এক-আধা দিন দেখব, সে উপায়ও নেই। আমার ঘুম এমন গাঢ়-স্বপ্নটপ্নের বালাই নেই। দূর ছাই!

নেমে পড়েছে সবাই। ওরে বাবা রে, কী কাদা! কোমর পর্যন্ত তলিয়ে যাবার দাখিল! হাসান আলি আরেকটু হলে গুলীর বাক্স নিয়ে নদীতে পড়ত। লাইটমেশিনগানটা সবাই মিলে চাপিয়েছে আমার কাঁধে। নামেই লাইট, আসলে মেলা ওজন। আকাশে গুডগুড মেঘ ডাকছে আবার। বৃষ্টি নামলেই গেছি।–মজিদের ভাষায় একেবারে পাটেটো চিপস হয়ে যাব।

হুমায়ূন আহমেদ

আজ সারাটা দিন আমার মন খারাপ ছিল; এখন মধ্যরাত্রি, ছপছপ শব্দে কাদা-ভরা রাস্তায় হাঁটছি। মনের সঙ্গে সঙ্গে শরীরও বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। এত দিনেও হাঁটার অভ্যেস হল না। আনিস এবং মজিদ কত নির্বিকার ভঙ্গিতেই না পা ফেলছে। এতটুকু ক্লান্ত না হয়েও তারা দশ মাইল হেটে পার হবে; বিপদ হবে আমাকে নিয়ে। জাফরও হাঁটতে পারে না। তবে আমার মতো এত সহজে ক্লান্তও হয় না। সমস্ত দলটির মধ্যে আমি সবচেয়ে দুর্বল। শরীরের দিক দিয়ে তো বটেই, মনের দিক থেকেও। তবুও আজকের জন্যে আমিই কমাণ্ডার। কমাণ্ডার শব্দটা শুনতে বড়ো গেয়ো। অধিপতি বা দলপতি হলে মানাত। না, আমি তেমন বাংলাপ্রেমিক নই। একুশে ফেব্রুয়ারিতে ইংরেজি সাইন-বোর্ড ভাঙার ব্যাপার আমার কাছে খুব হাস্যকর মনে হয়। যে-কোনো জিনিসের বাড়াবাড়ি আমাকে পীড়া দেয়। আর সে জন্যেই যুদ্ধে এসেছি।

এক মাইলও হাঁটি নি, এর মধ্যেই পা ভারি হয়ে এসেছে। কী মুশকিল! নিঃশ্বাস পড়ছে ঘনঘন। শার্ট ভিজে গিয়েছে ঘামে।

ঢাকা থেকে ভাই, বোন, বাবা, মা সবাইকে নিয়ে একনাগাড়ে ত্রিশ মাইল হেঁটে পৌঁছেছিলাম মির্জাপুর। কী কষ্ট, কী কষ্ট! নিজের জন্যে কিছু নয়। জরী ও পরীর দিকে তাকান যাচ্ছিল না। পরীর ফর্সা মুখ নীল বর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আমাদের সঙ্গে অনেকেই হাঁটছিলেন। কাফেলার মতো ব্যাপার। এক-এক বার হুস করে সুখী মানুষেরা গাড়ি নিয়ে উড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, আমরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি। এমন হৃদয়বান কাউকে কি পাওয়া যাবে, যে

আমাদের একটুখানি লিফট্ দেবে! দুঃসময়ে সবাই হৃদয়হীন হয়ে পড়ে। আমাদের সঙ্গে এক জন গর্ভবতী মহিলা ক্লান্ত পায়ে হাঁটছিলেন। তিনি ক্রমাগতই পিছিয়ে পড়ছিলেন। ভদ্রমহিলাস্ত্র স্বামী তা দেখে রেগে আগুন। রাগী গলায় বললেন, টুকুস টুকুস করে হাঁটছ যে? তোমার জন্যে আমি মরব নাকি? এই দীর্ঘ পথে কত কথাবার্তা হয়েছে কত জনের মধ্যে। কত অশ্রুবর্ষণ, কত তামাশা।–কিছুই আজ আর মনে নেই, কিন্তু ঐ স্বামী বেচারার কথাগুলি এখনো কাঁটার মত বুকে বিধে আছে। গর্ভবতী মহিলার শোকাহত চোখ এখনো চোখে ভাসে।

রাস্তাতেই পরীর হুঁ-হু করে জ্বর উঠে গেল। আমি বললাম, কোলে উঠবি পরী? পরীর কী লজ্জা। ক্লাস টেনে পড়ে মেয়ে, দাদার কোলে উঠবে কি? পরী অপ্রকৃতিস্থের মতো পা ফেলে হাঁটতেই থাকল। তার হাত ধরে–ধরে চলছি আমি। ঘামে ভেজা গরম হাত, আর কী তুলতুলে নরম। পরীর হাতটা যে এত নরম, তা আগে কখনো জানি নি। জরীর হাত ভীষণ খসখসে, অনেকটা পুরুষালি। কিন্তু পরীর হাত কী নরম, কী নরম।

মীর্জাপুরের কাছাকাছি এসেই পরী নেতিয়ে পড়ল। জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, আমার ঘুম পাচ্ছে। বমি করতে লাগল ঘনঘন। বাবা একেবারে দিশাহারা হয়ে পড়লেন। কোথায় ডাক্তার কোথায় কি? এর মধ্যে গুজব রটে গিয়েছে, ঢাকা থেকে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের এক দল জোয়ানকে মিলিটারিরা এই দিকেই তাড়া করে আনছে। চারদিকে ছুটোছুটি, চিৎকার, আতঙ্ক। মা এবং জরী ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে। বাবা যাকেই পাচ্ছেন তাকেই জিজ্ঞেস করছেন, কিছু মনে করবেন না, আপনি কি ডাক্তার?

ডাক্তার পাওয়া যায় নি, কিন্তু এক ভদ্রলোক দয়াপরবশ হয়ে তাঁর ট্রাকে আমাদের টাঙ্গাইল পৌঁছে দিলেন। টাঙ্গাইল পৌঁছালাম শুক্রবার সন্ধ্যায়। পরী মারা গেল রোববার রাতে। সন্ধ্যাবেলাতে কথা বলল ভালো মানুষের মতো। বারবার বলল, কোনো মতে দাদার বাড়ি পৌঁছতে পারলে আর ভয় নেই। তাই না বাবা?

পরীর মৃত্যু তো কিছুই নয়। কত কুৎসিত মৃত্যু হয়েছে চারপাশে। মৃত্যু এসেছে। সীমাহীন বীভৎসতার মধ্যে। কত অসংখ্য অসহায় মানুষ প্রিয়জনের এক ফোঁটা চোখের জল দেখে মরতে পারে নি। মরবার আগে তাদের কপালে কোনো স্নেহময় কোমল করস্পর্শ পড়ে নি।

অনেক মধ্যরাত্রিতে যখন অতলস্পর্শী ক্লান্তি আমাকে আচ্ছন্ন করে কেলে তখন মনে হয় আমার হাত ধরে টুকটুক পা ফেলে পরী হাঁটছে।

যে-জান্তব পশুশক্তির ভয়ে পরী ছোট ছোট পা ফেলে ত্রিশ মাইল হেঁটে গেছে, আমার সমস্ত ক্ষমতা ও শক্তি তার বিরুদ্ধে। আমি রাজনীতি বুঝি না। স্বাধীনতাটাধীনতা নিয়ে সে-রকম মাথাও ঘামাই না। শুধু বুঝি, ওদের শিক্ষা দিতে হবে। জাফর প্রায়ই বলে, হুমায়ূন ভাই ইচ্ছে করে চোখ বুজে থাকেন। হয়তো থাকি। তাতে ক্ষতি কিছু নেই। আমি কি আমার দায়িত্ব পালন করি নি, জাফর?

মনে মনে এই কথা বলে আমি একটু হাসলাম। জাফরের সঙ্গে আজ ভোরে আমার খানিকটা মন কষাকষি হয়েছে। সে চাচ্ছিল। আজকের এই এ্যাসাইনমেন্টের নেতৃত্ব যেন আসলাম পায়। জানি না। এর পেছনের সত্যিকার কারণটি কি? দলপতির পুতি আস্থা না থাকা বড়ো বিপজ্জনক। মুশকিল হচ্ছে-আমরা রেগুলার আর্মির লোকজন নই। আনুগত্য হল একটা অভ্যাস, যা দীর্ঘদিনের টেনিং-এর ফলে মজ্জাগত হয়। রেগুলার আর্মির এক জন

অফিসারের অনুচিত হুকুমও সেপাইরা বিনা দ্বিধায় মেনে নেবে। কিন্তু আমার হুকুম নিয়ে তারা চিন্তা-ভাবনা করবে। পছন্দ না হলে কৈফিয়ত পর্যন্ত তলব করে বসবে। কাজেই আমার প্রথম কাজ ছিল দলের লোকের আস্থা অর্জন করা। বুঝিয়ে দেওয়া যে, আমার উপর নির্ভর করা যেতে পারে। কিন্তু আমি তা পারি নি। কাপুরুষ হিসেবে মার্কা-মারা হয়ে গেছি।

যদিও তারা সব সময়ই হুমায়ূন ভাই, হুমায়ূন ভাই করে এবং সবাই হয়তো একটু শ্রদ্ধাও করে, কিন্তু সে-শ্রদ্ধা এক জন যোদ্ধা হিসেবে নয়।

আমার প্রথম ভুল হল আমি হাজী সাহেবের মৃত্যুতে সায় দিতে পারি নি। লোকটার নৃশংসতা সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না। মৃত্যুদণ্ড যে তার প্রাপ্য শাস্তি, এতেও ভুল নেই। তবু আমার মায়া লাগল। ষাটের উপর বয়স হয়েছে। মরবার সময় তো এমনিতেই হল। তবু বাঁচবার কী আগ্রহ! সে আমাদের বিশ হাজার টাকা দিতে চাইল। শুনে আমার ইচ্ছে হল, একটা প্রচণ্ড চড় কষিয়ে দি। কিন্তু আমি শান্ত গলায় বললাম–জাফর, হাজী সাহেবকে ক্যাম্পে নিয়ে চল। জাফর চোখ লাল করে তাকাল আমার দিকে। থেমে থেমে বলল, একে কুকুরের মতো গুলী করে মারব। হাজী সাহেব চিৎকার করে আল্লাহকে ডাকতে লাগলেন। এই তিনিই যখন মিলিটারি দিয়ে লোকজন মারিয়েছেন, তখন সেই লোকগুলিও নিশ্চয়ই আল্লাহকে ডেকেছিল। আল্লাহ তাদের যেমন রক্ষা করেন নি-হাজী সাহেবের বেলায়ও তাই হল। হাজী সাহেব অপ্রকৃতিস্থ চোখে তাকিয়ে মৃত্যুর প্রস্তুতি দেখতে লাগলেন। জাফর এক সময় বলল, তওবা-টওবা যা করবার করে নেন। দোওয়াকালাম পড়েন। হাজী সাহেব। আর তখন হাজী সাহেব চিৎকার করে তাঁর মাকে ডাকতে লাগলেন।

ও মাইজি গো, ও মাইজি গো। কতকাল আগে হয়তো এই মহিলা মারা গেছেন। সেই মহিলাটিকে হাজী সাহেব হয়তো ভুলেই গিয়েছিলেন। আজ রাইফেলের কালো নলের সামনে দাঁড়িয়ে আবার তাঁর কথা মনে পড়ল। আল্লাহর নাম চাপা পড়ে গেল। এক অখ্যাত গ্রাম্য মহিলা এসে দাঁড়ালেন সেখানে।

আমি পিছিয়ে পড়েছিলাম। আনিস বলল, রাইফেলটা আমার কাছে দিন, হুমায়ূন ভাই। আমি একটু লজ্জা পেয়ে গেলাম। জাফর এবং হাসান আলি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের উঁচু সড়কে উঠে পড়েছে। বেশ কিছু দূর এগিয়ে রয়েছে তারা। দ্রুত পা চালাচ্ছি। উঁচু সড়কে উঠে পড়তে পারলে হাঁটা অনেক সহজ হবে। পরিষ্কার রাস্তা, জল-কাদা নেই। এখান থেকেই আমরা সরাসরি গ্রামের ভেতর দিয়ে চলব। আমি উঠে আসতেই মজিদ বলল, জোঁক ধরেছে নাকি দেখেন ভালো করে। আনিসের পা থেকে তিনটি জোঁক সরান হয়েছে। একটা রক্ত খেয়ে একেবারে কোলবালিশ হয়ে গিয়েছিল।

হাসান আলি টর্চ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পায়ে উপর ফেলতে লাগল। না, জোঁকটোক নেই। তবে শামুকে লেগে পা অল্প কেটেছে। জ্বালা করছে। মজিদ বলল, একটু রেস্ট নিই, মালগাড়ির মতো টায়ার্ড হয়ে গেছি। দেখি আনিস, একটা সিগারেট।

আনিস সিগারেটের প্যাকেট খুলল। হাসান আলিও হাত বাড়িয়ে সিগারেট নিল। সে আমাদের সামনে খাবে না, তাই একটু সরে গেল। আনিস বলল, আপনিও নিন একটা হুমায়ূন ভাই। সিগারেট টানলে আমার জিভ জ্বালা করে। নিকোটিন জিভের উপর জমা হয় হয়তো। তবুনিলাম একটা। আমাদের এখন সাহস দরকার। আগুনের স্পর্শ সে সাহস দেবে হয়তো। দেয়াশলাই সবে জ্বলিয়েছি, অমনি বাঁশবনের অন্ধকার থেকে কুকুর ডাকতে

লাগল। তার পরপরই একটি ভয়ার্ত, চিৎকার শোনা গেল, কোডা, ঐখানে কেডা? কতা কয় না লোকটা! কেডা গো?

হারিকেন হাতে দু-চার জন মানুষও বেরিয়ে এল। ও রমিজের বাপ, ও রমিজের বাপ বলে চিকন কণ্ঠে তুমুল চিৎকার শুরু করল একটি মেয়ে। সবাই বড়ো ভয় পেয়েছে। এর মধ্যে অল্পবয়সী একটি শিশু তারস্বরে কাঁদতে শুরু করল। মজিদের উচ্চকণ্ঠ শোনা গেল, ভয় নাই, আমরা।

তোমরা কেডা?

আমরা মুক্তিবাহিনীর লোক।

কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের চারপাশে ভিড় জমে উঠল। হারিকেন হাতে ভয়কাতর লোকগুলি ঘিরে দাঁড়াল আমাদেম। অস্পষ্ট আলোয় রাইফেলের কালো নল চিকচিক করছে। আমরা তাদের সামনে অষ্টম আশ্চর্যের মতো দাঁড়িয়ে আছি।

মিয়া সাবরা এটু পান তামুক খাইবেন?

না। আপনারা এত রাতেও জাগা, কারণ কি?

বড়ো ডাকাইতের উপদ্রব। ঘুমাইতাম পারি না। জাইগা বইয়া থাকি।

এই দিকে মিলিটারি আসছিল?

জ্বি না। তয় রাজাকার আইছিল দুই বার। রমেশ মালাকাররে বাইন্ধা লইয়া গেছে। গয়লা পাড়া পুড়াইয়া দিছে।

রাজাকারদের কেউ খাতির যত্ব করেছিল নাকি?

জ্বি না, জ্বি না।

এই গ্রামের কেউ রাজাকারে নাম লেখাইছে?

লোকগুলি চুপ করে রইল। জাফর ধমকে উঠল, বল ঠিক করে।

এক জন গেছে। কী করব মিয়া সাব, পেটে ভাত নাই। পুলাপানিডি ক্যান্দে।

আমি বললাম, দেরি হয়ে যাচ্ছে, চল হাঁটা দিই।

আনিসের বোধহয় কিছু কথা বলবার ইচ্ছে ছিল। সে অপ্রসন্ন ভঙ্গিতে হাঁটতে শুরু করল।

আনিসের এই স্বভাব আমি লক্ষ করেছি। মানুষের সপ্রশংস চোখ তার ভারি প্রিয়। যখনি আমাদের ঘিরে কিছু কৌতূহলী মানুষ জড় হয়, তখনি সে খুব ব্যস্ত হয়ে এল এম জি র ব্যারেল নাড়তে থাকে বা খামকাই গুলীর কেসটা খুলে ফেলে। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে এমন একটা ভঙ্গি করে, যেন ভারি বিরক্ত হয়েছে। বক্তৃতা দিতেও তার খুব উৎসাহ দেশের এই দুদিনে আমাদের কী করা উচিত, এ সম্বন্ধে তার সারগর্ভ ভাষণ তৈরী। টেপ রেকর্ডারের মতো।–চালু করে দিলেই হল। গ্রামে গ্রামে প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন করতে হবে। চোর, ডাকাত, দালাল নির্মূল করতে হবে। দখলদার বাহিনীকে দাঁত-ভাঙা জবাব দিতে হবে।

ইত্যাদি ইত্যাদি। বক্তৃতা শেষে কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বিকট সুরে চেঁচিয়ে ওঠে-জয় বাংলা! জয় বঙ্গবন্ধু!

আনিস ছেলেটিকে আমি খুব পছন্দ করি। চমৎকার ছেলে, একটু পাগলাটে। অপারেশনের সময় সব বিচারবুদ্ধি খুইয়ে বসে। গুলী ছেড়ে এলোপাথাড়ি। পেছনে সরতে বললে ক্রল করে সামনে এগিয়ে যায়। সামনে এগুতে বললে আচমকা পেছন দিকে দৌড় মেরে বসে।

মেথিকান্দায় প্রথম অপারেশনে গিয়েছি। আমাদের বলে দেওয়া হয়েছে, একেবারে ফাঁকা ক্যাম্প। চার জন পশ্চিম পাকিস্তানী রেঞ্জার আর গোটা পনের রাজাকার ছাড়া আর কেউ নেই। রাত দুটোয় অপারেশন শুরু হল। আমি আর সতীশ গর্তের মতো একটা জায়গায় পজিশন নিয়েছি। বেশ বড়ো দল আমাদের। সবাই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছি। দলের নেতা হচ্ছেন আবু ভাই। কথা আছে পশ্চিম দিক থেকে আবু ভাই প্রথম গুলী চালাতে শুরু করবেন, তার পরই মাথা নিচু করে খালের ভেতর দিয়ে চলে আসবেন আমাদের কাছে। আমরা সবাই পূর্ব দিকে বসে আছি। আনিস আর রমজান উত্তরে একটা মাটির টিবির আড়ালে চমৎকার পজিশন নিয়েছে। রমজান খুব ভালো মেশিনগানার। বসে আছি তো আছিই, আবু ভাইয়ের গুলী করার কোনো লক্ষণই দেখি না। সবাই অধৈর্য হয়ে উঠেছি। আচমকা আমাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে গুলীবর্ষণ হতে লাগল। আমরা হতবুদ্ধি। অবশ্যি সবারই পজিশন ভালো। গায়ে গুলী লোগবার প্রশ্নই ওঠে না। তবু একদল ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল আর তার পরই মর্টারে গোলাবর্ষণ হতে লাগল। আমাদের দিকে সবাই চুপচাপ। হতভম্ভ হয়ে গিয়েছি। রমজান মিয়া এই সময় উঁচু গলায় চেঁচিয়ে উঠল, কেউ ভয় পাবেন না, কেউ ভয় পাবেন না।

তার পরই রমজান মিয়ার মেশিনগানের ক্যাটিক্যাট শব্দ শোনা যেতে লাগল। সতীশকে বললাম, শুরু করা দেখি, আল্লাহ ভরসা। আর তখনি মর্টারের গোলা এসে পড়ল। বারুদের গন্ধ ও ধোঁয়ায় চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে গেল। ধোঁয়া পরিষ্কার হতেই দেখি আমি আনিসের কাধে শুয়ে। আনিস প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে। সবাই যখন পালিয়েছে, সে তখন জীবন তুচ্ছ করে খোঁজ নিতে এসেছে আমার। মেথিকান্দার সেই যুদ্ধে আমাদের চার জন ছেলে মারা গেল। রমজান মিয়ার মতো দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হারলাম।

গুলী লেগে আবু ভাইয়ের ডান হাতের দুটি আঙুল উড়ে গেল। আবু ভাই তারপর একেবারে ক্ষেপে গেলেন। পাঁচ দিন পরই আবার দল নিয়ে এলেন মেথিকান্দায়। সেবারও দটি ছেলে মারা গেল। তৃতীয় দফায় আবার এলেন। সেবারও তাই হল। মিলিটারিরা তত দিনে মেথিকান্দাকে দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করিয়েছে। চারিদিকে বড়ো বড়ো বাঙ্কার, রাত-দিন কড়া পাহারা। গুজব রটে গেল, মেথিকান্দা মুক্তিবাহিনীর মৃত্যুকূপ। সতীশ বলত, যদি বলেন তাহলে গভর্ণর হাউসে বোমা মেরে আসব, কিন্তু মেথিকান্দায় যাব না, ওরে বাপ রে।

কিন্তু আবু ভাইয়ের মুখে অন্য কথা, মেথিকান্দা আমিই কাজ করব। যদি না পারি, তাহলে গু খাই। চতুর্থ বারের মতো তিনি বিরাট দল নিয়ে গেলেন সেখানে। সবাই ফিরল, আবু ভাই ফিরলেন না।

পঞ্চম বারের মতো যাচ্ছি। আমরা। আমার কি ভয় লাগছে নাকি? ছিঃ হুমায়ূন ছিঃ একটির পর একটি জায়গা তোমাদের দখলে চলে আসছে, মেথিকান্দায ঘাঁটি করে এক বার যদি সোনারদির রেলওয়ে ব্রীজ উড়িয়ে দেওয়া যায়, তাহলে বিরাট একটা অংশ তোমাদের হয়ে

যাবে। আর এত ভয় পাওয়ারই—বা কী? মৃত্যুকে এত ভয় পেলে চলে? একটা গল্প আছে না–এক নাবিককে এক জন সংসারী লোক জিজ্ঞেস করল, আপনার বাবা কোথায় মারা গেছিলেন?

তিনি নাবিক ছিলেন। সমুদ্রে জাহাজ ডুবি হয়ে মরেছেন।

আর আপনার দাদা?

তিনিও ছিলেন নাবিক। মরেছেন জাহাজ ডুবিতে।

সংসারী লোকটি আত্মকে উঠে বলল, কী সর্বনাশ! আপনিও তো মশাই নাবিক। আপনিও তো জাহাজ ডুবি হয়ে মরবেন!

নাবিকটি বলল, তা হয়তো মরব। কিন্তু নাবিক না হয়েও আপনার দাদা বিছানায় শুয়ে মরেছেন, ঠিক নয় কি?

হ্যাঁ।

আপনার বাবাও বিছানাতেই মরেছেন, নয় কি?

হ্যাঁ, হাসপাতালে!

আপনিও সেইভাবেই মরবেন। তাহলে বেশ-কমটা হল কোথায়?

আসল কথা, আমার ভয় লাগছে। সাহস সঞ্চায়ের চেষ্টা করছি। ভয় পাওয়াতে লজ্জার কিছু আছে কি? আমার লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই, এই মনে করে গুনগুন করে গান গাইতে চেষ্টা করলাম।–সেদিন দুজনে। শিস দিয়ে আমি বেশ ভালো সুর তুলতে পারি। কিন্তু গান গাইতে গেলেই চিত্তির। জরী বলে, তোমার মীড়গুলি খুব ভালো আসে, আর কিছুই হয় না। কি জানি বাবা, মীড় কাকে বলে। আমি এত সব জানি না। আমি তো তোর মতো বিখ্যাত শিল্পী নই, গান নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথাও নেই। বাথরুমে গোসল করতে করতে একটু গুনগুন করতে পারলেই হল।

জাফরটা ভীষণ গান-পাগল। যেই গুনগুন করে একটু সুর ধরেছি, অমনি সে পিছিয়ে পড়েছে। এখন সে আমার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটবে। জাফর যাতে ভালোমতো শুনতে পায়, সেই জন্যে আরেকটু উঁচু গলায় গাইতে শুরু করলাম। আমার গুনগুন শুনেই এই? জরীর গান শুনলে তো আর হুঁশি থাকবে না। জাফরকে এক দিন কথায় কথায় জিজ্ঞেস করেছিলাম, গান গায় যে কানিজ আহমেদ, তার নাম শুনেছি? সে চমকে উঠে বলল, নজরুল— গীতি গান যিনি, তাঁর কথা বলছেন?

হ্যাঁ।

খুব শুনেছি। আপনি চেনেন নাকি?

আমি সে-কথা এড়িয়ে গিয়েছি। যুদ্ধটুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে জাফরকে এক দিন বাসায় নিয়ে যাব। জরীকে ডেকে এনে পরিচয় করিয়ে দেব, এর নাম আবু জাফর শামসুদ্দীন। আমরা একসঙ্গে যুদ্ধ করেছি। আর জাফরকে হেসে বলব, জাফর, এর নাম হল জরী। আমার ছোট বোন। তুমি চিনলে চিনতেও পার, গানটান গায়, কানিজ আহমেদ। শুনেছি হয়তো।

জাফর নিশ্চয়ই চোখ বড়ো করে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকবে। সেই দৃশ্যটি আমার বড়ো দেখতে ইচ্ছে করছে। তা ছাড়া আমার মনে একটি গোপন বাসনা আছে। জরীর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেব জাফরের। যুদ্ধের মধ্যে যে-পরিচয়, তার চেয়ে খাঁটি পরিচয় আর কী হতে পারে? জাফরকে আমি ভালোভাবেই চিনেছি।

কিন্তু জরীর কি পছন্দ হবে? বড়ো খুঁতখুতে মেয়ে। সমালোচনা করা তার স্বভাব। কেউ হয়তো বাসায় গিয়েছে আমার খোঁজে, জারী আমাকে এসে বলবে, দাদা, তোমার এক জন চ্যাপ্টা মতো বন্ধু এসেছে। অরুণকে সে বলত কাৎলা মাছ। অরুণ রেগে গিয়ে বলেছিল, কাৎলা মাছের কী দেখলে আমার মধ্যে? জরী সহজভাবে বলেছে, তোমার মাথাটা শরীরের তুলনায় বড়ো তো, এই জন্যে। আচ্ছা, রাগ করলে আর বলব না। আদর দিয়ে-দিয়ে মা জরীর মাথাটি খেয়ে বসে আছেন। অল্প বয়সেই অহংকারী আর আহ্লাদী হয়ে উঠেছে।

কে জানে এর মধ্যে বিয়েই হয়ে গেছে হয়তো। অনেক দিন তাদের কোনো খবর পাই না। শুনেছি। বাবা আবার ঢাকা ফিরে এসেছেন। ওকালতি শুরুর চেষ্টা করছেন। দেশে এখন কি আর মামলা–মোকদ্দমা আছে? টাকা-পয়সা রোজগার করতে পারছেন। কিনা কে জানে।

ঢাকার অবস্থা নাকি সম্পূর্ণ অন্য রকম। কিছু চেনা যায় না। ইউনিভার্সিটি পাড়া খা-খী করে। দুপুরের পর রাস্তাঘাট নিঝরঝুম হয়ে যায়। ঢাকায় বড়ো যেতে ইচ্ছে করে। কত দিন ঢাকায় যাওয়া হয় না। আবার কি কখনো এ-রকম হবে যে নির্ভয়ে ঢাকার রাস্তায় হেটে বেড়াব! সেকেণ্ড শো সিনেমা দেখে কোনো একটা রেস্টুরেন্টে বসে চা খেয়ে গভীর রাতে বাড়ি ফিরব!

সলিল কিছুদিন আগে গিয়েছিল ঢাকায়। অনেক গল্প শুনলাম তার কাছে। খুব নাকি বিয়ে হচ্ছে সেখানে। বয়স্থা মেয়েদের সবাই ঝটপট বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে। ঘরে রাখতে সাহস পাচ্ছে না। হতেও পারে। সলিল অবশ্যি বেশি কথা বলে, তবুও বিয়ে কি আর হচ্ছে না? বিয়ে হচ্ছে। নতুন শিশুরা জন্মাচ্ছে। মানুষজন হাট-বাজার করছে। জীবন হচ্ছে বহতা নদী।

একি! আবু ভাইয়ের মতো ফিলসফি শুরু করলাম দেখি। আবু ভাই কথায় কথায় হাসাতেন, আবার তার ফাঁকে ফাঁকে এত সহজভাবে এমন সব সিরিয়াস কথা বলে যেতেন–আশ্চর্য! আবু ভাই তাঁর অসংখ্য ভক্ত রেখে গেছেন, যারা তাঁকে দীর্ঘ দিন মনে রাখবে। এই–বা কম কী?

এক দিন হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে এলেন আবু ভাই। দারুণ খুশি-খুশি চেহারা। মাথার লম্বা চুল ঝাঁকিয়ে বললেন, হুমায়ূন, গুড নিউজ আছে। মিষ্টি খেতে চাও কিনা বল।

চাই চাই।

ভেরি গুড নিউজটা পরশু শোনাব। মিষ্টি যোগাড় করি আগে, তার পর। পরশু। সন্ধ্যায় সবাইকে মিষ্টি খাওয়াব।

সেই গুড নিউজটি শোনা হয় নি। দারুণ ব্যস্ততা শুরু হল হঠাৎ ছড়িয়েছিটিয়ে পড়লাম সবাই। এবং সবশেষে আবু ভাই গেলেন মেথিকান্দা।

আবু ভাইয়ের লাশ হাসান আলি বয়ে এনেছিল। বিশেষ কোনো কথাবার্তা বলে নি। হাউমাউ করে কাঁদেও নি। অথচ সবাই সেদিন বুঝেছিলাম, হাসান আলির মন ভেঙে গেছে।

মজিদ ডাকল, পা চালিয়ে হুমায়ূন ভাই, আপনি বারবার পিছিয়ে পড়ছেন। হাসান আলি দেখি হন।হন করে এগিয়ে চলছে। এত চুপচাপ থাকে কেন লোকটা?

হাসান আলি

চেয়ারম্যান সাব কইলেন, হাসান আলি রাজাকার হইয়া পড়। সত্তুর টাকা মাসমাইনা, তার সাথে খোরাকি আর কাপড়।

চেয়ারম্যান সাব আমার বাপের চেয়ে বেশি। নেকবক্ত পরহেজগার লোক। তাঁর ঘরের খাইয়া এত বড়ো হইলাম। আমার চামড়া দিয়া চেয়ারম্যান সাহেবের জুতা বানাইলেও ঋণ শোধ হয় না। তাঁর কথা ফেলতে পারি না। রাজাকার হইলাম।

জুম্মাবাদ চেয়ারম্যান সাব আর তাঁর বিবিরে কদমবুসি কইরা গাঁটরি মাথায় লইলাম। চেয়ারম্যান সাব কইলেন, আল্লাহর হাতে সোপর্দ হাসান আলি, আল্লাহ নেকাবান। সাচ্চা দিলে কাম করব। হালাল পয়সা খাইবা।

যাওনের আগে মসজিদে গেলাম দেওয়া মাঙতে। গিয়া দেখি মান্নুদে এলাহি–মসজিদের মাথার উপর শকুন বইয়া আছে। দুই কুড়ির উপরে বয়স তুমি, এত বড়ো শকুন দেখি নাই। মনডো বড়ো টানল। বুকের মধ্যে ছ্যাৎ কইরা উঠল।

আরো একবার মসজিদের উপরে শকুন বইছিল। আমি তখন ছোড। চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়িতে গরু-রাখালের কাম করি। বাপজান কইলেন, হাছান, শকুন বইছে মসজিদে। বড়ো খারাপ নিশানা। কেয়ামত নজদিক। বালা-মুসিবত আইব। বাপজানের কথা মিছা হয় নাই। কলেরায় দেশটা সাফা হইয়া গেল!

মসজিদে মওলানা সাব কইলেন, হাসান, তুমি রাজাকার হইতোছ শুনলাম।

হ মৌলানা সাব। দোওয়া মাঙতে আইছি।

বালা করছি। পাকিস্তানের খেদমত কর। কিন্তু হাসান আলি একটা কথা।

কী কথা মৌলানা সাব—

শুনতাছি রাজাকার বড়ো অত্যাচার করে। মানুষ মারে, লুটপাট করে, ঘর জ্বালায়। দেইখ বাবা, সাবধান। আল্লাহর কাছে জবাবদিহি হইবা। আখেরাতে নবীজীর শেফায়ত পাইবা না।

মনডা খারাপ হইল। কামড়া বোধহয় ভুল হইল। তখনও আমরার গ্রামের মধ্যে রাজাকার-দল হয় নাই। আমরা হইলাম পরথম দল। সাত দিন হইল টেনিং। লেফট রাইট, লেফট রাইট। বন্দুক সাফ করণের কায়দা শিখলাম, গুলী চালাইতে শিখলাম। বায়োনেট চারজ করতে শিখলাম। মিলিটারিরা যত্ন কইরা সব শিখাইল। তারা সব সময় কাঁইত তুমি সাচ্চা পাকিস্তানী, মুক্তিবাহিনী একদম সাফা কর দে। মানডার মধ্যে শান্তি পাই না। বুকটা কান্দে। রাইতে ঘুম হয় না। আমরার সাথে ছিল রাধানগরের কেরামত মওলা। সে আছিল রাজাকার কমাণ্ডার। আহা, ফেরেস্তার মতো আদমি। আর মারফতি গান যখন গাইত, চিউক্ষে পানি রাখেন যাইত না। মাঝেমধ্যেই কেরামত ভাইয়ের গান শুনতাম–

ও মনা
দেহের ভিতরে অচিন পাখি অচিন সুরে গায়

তার নাগাল পাওয়া দাও

যখন হিন্দুর ঘরে আগুন দেওয়া শুরু হইল, কেরামত ভাই কইলেন, এইটা কী কাণ্ড! কোনো দোষ নাই, কিছু নাই–ঘরে কেন আগুন দিমু? ওস্তাদজী কইলেন–ও তো ইন্দু হ্যাঁয়, গাদ্দার হ্যাঁয়।

কেরামত ভাইয়ের সাহসের সীমা নাই। বুক ফুলাইয়া কইল, আগুন নেই দেঙ্গা।

ওস্তাদজী কইলেন, আও হামারা সাথ। কেরামত ভাই গেলেন। দুই দিন পরে তার লাশ নদীতে ভাইস্যা উঠল। ইয়া মাবুদে এলাহি, ইয়া পরওয়ার দেগার, কী দেখলাম, কী দেখলাম। মাথা একেবারে বেঠিক হইয়া গেল। মিলিটারি যা করে, তাই করি। নিজের হাতে আগুন লাগাইলাম সতীশ পালের বাড়ি, কানু চক্রবর্তীর বাড়ি, পণ্ডিত মশাইয়ের বাড়ি। ইস, মনে উঠলেই কইলজাটা পুড়ায়।

শেষমেষ মিলিটারিরা শরাফত সাহেবের বড়ো পুলাডারে ধইরা আনল। আহা রে, কী কান্দন ছেলের! এখনো চউক্ষে ভাসে। বি... এ... পাশ দিয়া এম... এ... পড়ত। যেমন সুন্দর চেহারা, তেমন আচারব্যাভার। ভদ্রলোকের ছেলে যেমন হওনের তেমন। এক দিন বাজারে বইয়া আছি। শরাফত সাহেবের পুলাডার সাথে দেখা। আমারে দেইকা কইল, হাছান ভাই, ভাল আছেন? আমি একটা কামলা মানুষ। আমারে আপনে কওনের কী দরকার? কিন্তু সেই ছেলে শিক্ষিত হইলে কী হইব, মনডা ছিল ফিরিশতার। আহা রে, বন্দুকের সামনে দাঁড়াইয়া কেমন কালা হইয়া গেল চেহারাটা। আমি একটু দূরে খাড়াইয়া আল্লাহ্ রসুলের নাম নিতাছি। আমার মাথার গুণ্ডগোল হইয়া গেছে। কী করতাম ভাইব্যা পাই না। শেষকালে ছেলেডা আমার দিকে চাইয়া কইল, হাসান ভাই আমারে বাঁচান। ক্যাপ্টেন সায়েবের পাও

জড়াইয়া ধরলাম। লাভ হইল না। আহা রে, ভাই রে আমার। কইলজাডা পুড়ায়। আমি একটা কুত্তার বাচ্চা। কিছু করবার পারলাম না।

সইন্ধ্যা কালে শরাফত সায়েবের বাড়িত গিয়া দেখি, ঘরদোয়ার অন্ধকার। ছেলেডার মা একলা বইয়া আছে। তারে কেউ গুলীর খবর কয় নাই। আমারে দেইক্যা কইল, ও হাছান, আমার ছেলেডা বাঁইচ্চা আছে? আল্লাহর দোহাই-হাছা কথা কইবা।

আমি তাঁর পা ছুইয়া কইলাম, আম্মাজি বাঁইচ্চা আছে, আপনে চাইরডা দানাপানি খান।

সেই রাইতেই গেলাম মসজিদে। পাক কোরআন হাতে লইয়া কিরা কাটলাম। এর শোধ তুলবাম। এর শোধ না তুললে আমার নাম হাছান আলি না। এর শোধ না তুললে আমি বাপের পুলা না। এর শোধ না তুললে আমি বেজন্মা কুত্তা।

রাত্তিরে ক্যাম্পে ফিরতেই হাবিলদার সাব কইলেন পুর্বের বাঙ্কারে একটা লাশ পইড়া আছে, আমি যেন নদীর মধ্যে ফ্যালাইয়া দিয়া আসি।

কী সর্বনাশের কথা! ইয়া মাবুদে এলাহি। গিয়া দেখি কবিরাজ চাচার ছোট মাইয়াটা। ফুলের মতো মাইয়া গো। বারো-তেরো বছর বয়স, ইয়া মাবুদ ইয়া মাবুদ। কাপড় দিয়া শইলডা ঢাইক্যা কইলাম, ভইন, মাপ করিস। এইটা কি, চউক্ষে পানি আসে। কেন? আরে পোড়া চউখ! এখন পানি ফালাইয়া কি লাভ? আগে তো দেখলি না। আগে তো আন্ধা হইয়া রইলি।

সাথের পুলাপানিডির বড়ো পরিশ্রম হইতাছে। আল্লাহ আল্লাহ্ কইরা যদি রামদিয়া ঘাটে পৌঁছাইতে পারি, তয় রক্ষা। ইয়া মাম্বুদ, এই পুলাপানডিরে বাঁচাইয়া রাইখো গো। গরম পীরের দরগাত সিনি মানলাম। আমি তিন কালের বুড়া। আমি মন্তব্বলে কী? এক চেয়ারম্যান সাব ছাড়া কেউ এক ফোঁটা চউক্ষের পানি ফালাইত না। মরণের পরে হাসরের মাঠে যদি কবিরাজ চাচার মাইয়ার সাথে দেখা হয়, তয়। মাইয়ার হাত ধইরা কমু, ভইন, শোধ তুলছি। এখন কও তুমি আমারে মাফ দিছ কি দেও নাই।

আবদুল মজিদ

এখন বাজছে একটা।

আর এক ঘণ্টার মধ্যে কি রামদিয়া পৌঁছান যাবে? আমার মনে হয় না। হাসান আলিকে জিজ্ঞেস করলাম, আর কত দূর হাসান আলি?

জানি জবাব দেবে না, তবু জিজ্ঞেস করেছি, কারণ এখান থেকে রামদিয়া কত দূর তা জানে শুধু হাসান আলি। ব্যাটা নবাবের নবাব, কথা জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেবে না। দেব নাকি রাইফেলের বাঁট দিয়ে একটা–?

খিদে যা পেয়েছে, বলবার নয়। মনে হচ্ছে এক গামলা ভাত খেয়ে ফেলতে পারি। সেবার তালুকদার সাহেবের বাসায় জবর খাইয়েছিল। হারামজাদা ভীতুর একশেষ। মুক্তিবাহিনী এসেছে শুনে ভয়ে পেচ্ছাব করে দেবার মতো অবস্থা। আরো ব্যাটা বলদ, তুই কি দালাল নাকি রে? তুই ভয় পাস কী জন্যে? সারাক্ষণ হাত জোড় করে হে হে হে, কী বিশ্রী। তবে যাই হোক, খাইয়েছিল জবর। একেবারে এক নম্বর খানা। পোলাওটোলাও রোধে এলাহি কারবার। জিতা রাহ ব্যাটা। কইমাছ ভাজার স্বাদ এখনো মুখে লেগে রয়েছে। আমাদের খাওয়ার কি আর ঠিক-ঠিকানা আছে? এক বার দুদিন শুকনো রুটি খেয়ে থাকতে হল, সে রুটিও পয়সার মাল। আবু ভাই বলেছিলেন, খিদে পেলে শুধু খাওয়ার কথা মনে হয়। মহসিন হলে ফিস্ট হল এক বার। জনে জনে ফুল রোষ্ট। সেই সঙ্গে কাবাব, রেজালা আর দৈ-মিষ্টি। খেয়ে কুল পাই না। এমন অবস্থা। বাবুর্চি রাধত ফার্স্ট ক্লাস।

পায়ের কাটাটা জানান দিচ্ছে। ভাঙা শামুকের এমন ধারা প্রথমে ভাবলাম সাপে কামড়াল বুঝি। বর্ষা-বাদলা হচ্ছে সাপের সীজন। এ অঞ্চলে আবার শামুকভাঙা-কেউটের ছড়াছড়ি। ছোবল মেরে শামুক ভেঙে খায়। রাত-বিরাতে এরকম একটা সাপের গায়ে পা দিতে পারলে মন্দ হয় না। বন্দুক নিয়ে তাহলে এ রকম আর ঘুরে বেড়াতে হয় না। নিরবচ্ছিন্ন শান্তি যাকে বলে।

আমার আর ভালো লাগে না, সত্যি। কী হবে দু-একটা টুশ-টাশ করে? মিলিটারি কমছে কই? বন্যার জলের মতো শুধু বাড়ছে। রাজাকার পয়দা হচ্ছে হুঁ— হুঁ করে। যে অবস্থা, এক-দিন দেখব। আমরা কয় জন ছাড়া সবাই রাজাকার হয়ে বসে আছে। আর হবে নাই-বা কেন? প্রাণের ভয় নেই? রাজাকার হলে তাও প্রাণটা বাঁচে। তাছাড়া মাসের শেষে বাধা বেতন। লুটপাটের ঢালাও বন্দোবস্ত। দেখেশুনে মনে হয়, দূর শালা রাজাকার হয়ে যাই।

কী আরোল তাবোল ভাবছি। সোহরাব সাহেবের মতো মাথাটাই খারাপ হয়ে গেল নাকি? সোহবার সাহেবকে দেখে কে বলবে, তার মাথাটা পুরো ফরটি-নাইন হয়ে বসে আছে। দিব্যি ভালো মানুষ, মাঝে মাঝে শুধু বলবে, ইস, গুলীটা শেষে কপালেই লাগল।

দু মাস ছিল বেচারা মুক্তিবাহিনীতে। সাহসী বেপরোয়া ছেলে। আমগাছ থেকে একবার মিলিটারি জীপে গ্রেনেড মেরে এক জন আর্টিলারি ক্যাপ্টেনই সাবাড়ি করে দিল। দারুণ ছেলে। এক দিন খবর পাওয়া গেল, কোন বাজারে গিয়ে নাকি ধূমসে দিশী মদ গিলে ভাম হয়ে পড়ে আছে। মদের ঝোঁকে ভেউ ভেউ করে কাঁদছে আর বলছে, হায় হায়, ঠিক কপালে গুলী লেগেছে! আবু ভাইয়ের হুঁকুমে জাফর গিয়ে খুব বানোল। দুই রদ খেয়ে নেশা ছুটে গেল, কিন্তু ঐ কথাগুলি আর গেল না। রাতদিন বলত, ইস কী কাণ্ড, শেষ পর্যন্ত ঠিক

কপালে গুলী! ঘুম নেই খাওয়া নেই, শুধু এই বুলি। এখন কোথায় আছে কে জানে? চিকিৎসা হচ্ছে কি ঠিকমতো? আমার যদি এ-রকম হয় তবে তো বিপদের কথা।

দাঁড়ান, সবাই দাঁড়ান।

কে কথা বলে? হাসান আলি নাকি? ব্যাটা আবার হুকুম দিতে শুরু করল কবে থেকে? জায়গাটা ঘুপচি অন্ধকার, চারদিকে বুনো ঝোপঝাড়। পচা গোবরের দম আটকান গন্ধ আসছে। হুমায়ূন ভাই বললেন, কী হয়েছে হাসান আলি?

কিছু হয় নাই।

কী হয়েছে তা নিজ চোখেই দেখতে পেলাম। আনিস লম্বালম্বি পড়ে রয়েছে মাটিতে। এত বড়ো একটা জোয়ান চোখের সামনে আছাড় খেয়ে পড়ে গেল, আমি দেখতেও পেলাম না? কী আশ্চর্য! কী ভাবছিলাম। আমি? হাসান আলি ধরাধরি করে তুলল আনিসকে। কাদায়পানিতে সারা শরীর মাখামাখি। হুমায়ূন ভাই অবাক হয়ে বললেন, কী হয়েছে আনিস?

কি জানি, মাথাটা হঠাৎ ঘুরে উঠল।

দেখি তোমার হাত। আরে, এ যে ভীষণ জ্বর। কখন জ্বর উঠল?

কি জানি কখন।

আসি, আশেপাশের কোনো বাড়িতে তোমাকে রেখে যাই।

আমি হাঁটতে পারব।

পারতে হবে না। মজিদ, তুমি ওর হাতটা ধর।

গায়ে হাত দিয়ে দেখি, সত্যি গা পুড়ে যাচ্ছে। বাটা বলদ, বলবি তো শরীর খারাপ।

হাসান আলি বলল, সামনেই মুক্তার সাহেবের বাড়ি। আসেন, সেই বাড়িতেই উঠি।

জাফর বলল, কত দূর হে সেটা?

কাছেই, এক-পোয়া মাইল। জুম্মাঘরের দক্ষিণে।

হাঁটতে হাঁটতে পা ব্যথা হয়ে যায়; জুম্মাঘরও আসে না, এক-পোয়া মাইলেরও ফুরাবার নাম নেই। যতই জিজ্ঞেস করি, কত দূর হাসান আলি? হাসান আলি বলে, ঐ যে দেখা যায়।

মোক্তার সাহেবের বাড়িটি প্রকাণ্ড। গরিব গ্রামের মধ্যে বাড়ির বিশালত্ব চট মরে চোখে পড়ে। বাড়ির সামনে প্রশস্ত পুকুর। তার চারপাশে সারি–বাধা তালগাছ। আমরা বাড়ির উঠোনে দাঁড়াতেই রাজ্যের কুকুর ঘেউ ঘেউ শুরু করল। কী ঝামেলা রে বাবা! বাড়ির ভেতর থেকে কেউ এক জন পরিত্রাহি চেঁচাতে লাগল, আসগর মিয়া, আসগর মিয়া, ও আসগর মিয়া।

জাফর তার স্বাভাবসুলভ। উঁচু গলায় ডাকল, বাড়িতে কে আছেন? দরজা খোলেন।

হঠাৎ করে বাড়ির সব শব্দ থেমে গেল। আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। জাফর আবার বলল, ভয় নাই, আমরা মুক্তিবাহিনীর লোক। তাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। শেষ পর্যন্ত হাসান আলি বলল, গনি চাচা, আমি হাসান। তখনি খুট করে দরজা খুলে গেল। একটি ভয়-পাওয়া মুখ বেরিয়ে এল হারিকেন হাতে।

হাসান আলির কারবার দেখে গা জ্বলে যায়। তার গলা শুনলে যখন দরজা খুলে দেয়, তখন গলাটা একটু আগে শোনালেই হয়। জাফর বলল, বিরক্ত করলাম, কিছু মনে করবেন না। এই ছেলেটার শোওয়ার বন্দোবস্ত করেন। আমাদের ভাত খাওয়াতে পারবেন?

জ্বি জি, নিশ্চয়ই পারব।

আপনার নাম কি?

গনি। আব্দুল গনি।

ডাক্তার আছে এদিকে?

আছে, হোমিওপ্যাথ।

দুত্তোরি হোমিওপ্যাথ।

গনি সাহেব ছাড়া আরো দু জন লোক জড়ো হয়েছে। তারা চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে আছে। আনিস তোষকহীন একটি চৌকিতে শুয়ে পড়েছে। গনি সাহেব বললেন, কী হয়েছে ওনার? গুলী লেগেছে নাকি?

না। আপনি ভেতরে গিয়ে আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করেন।

জ্বি জ্বি।

বুড়ো ভদ্রলোক ব্যস্তসমস্ত হয়ে চলে গেলেন। দেখতে–দেখতে বাড়ি জেগে উঠল। কত রকম ধ্বনি শোনা যাচ্ছে–আমিনা আমিনা হারিকোনটা কই?, দূর ধূমসী, ঘুমায় কি!

ভাগ্য ভালো, বাড়িটি এক পাশে। পাড়ার লোক সেই কারণেই ভেঙে পড়ল না। গনি সাহেব একধামা মুড়ি আর গুড দিয়ে গেলেন। বললেন, অল্পক্ষণের মধ্যেই রান্না হবে। আনিসকে তুলতে গিয়ে দেখি সে অচৈতন্য। মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙছে।

আনিসের শরীর যে এতটা খারাপ, ধারণা করিনি। নৌকায় ওঠার সময় অবশ্যি এক বার বলেছিল বমি বমি লাগছে। কিন্তু এ রকম অসুস্থ হয়ে পড়বে, কে ভেবেছিল? আনিসটা মেয়েমানুষের মতো চাপা।

দেখতে পাচ্ছি, আনিসকে নিয়ে ব্যস্ততা শুরু হয়েছে। হাসান আলি পানি ঢালছে মাথায়। জাফর প্রবল বেগে হাতের তালুতে গরম তেল মালিশ করছে। বাড়ির কর্তা, মোক্তার সাহেব বিপন্ন মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। এতক্ষণ লক্ষ করি নি পেছন থেকে দেখলে মোক্তার সাহেবকে

অনেকটা আমার বাবার মতো দেখায়। ঠিক সে-রকম ভয়াট শরীর, প্রশস্ত কাঁধ! আশ্চর্য মিল!

আনিসের জ্ঞান ফিরল অল্পক্ষণেই এবং সে লজ্জিত হয়ে পড়ল। হুমায়ূন ভাই বললেন, নাও, দুধটা খাও আনিস।

দুধ লাগবে না, দুধ লাগবে না।

আহা খাও।

আনিস বিব্রত মুখে দুধের গ্লাসে চুমুক দিল। আনিসকে কিন্তুতকিমাকার দেখাচ্ছে। তার ভেজা মাথা থেকে পানি গড়িয়ে পড়ছে। সারা শরীরে। মুখময় দাঁড়ি— গোঁফের জঙ্গল। তার মধ্যে সরু একটা নাক ঢাকা পড়ে আছে।

জাফর বলল, আনিস থাক এখানে।

হুমায়ূন ভাই বললেন, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।

রাত দুটো বাজতে বেশি দেরি নেই। রামদিয়ায় আমাদের জন্যে টুনু মিয়ার দল অপেক্ষা করছে। হুমায়ূন ভাই বললেন, আনিস, কয়টা বাজে দেখ তো।

একটা পঁয়ত্রিশ।

বল কী!

মোক্তার সাহেব, রামদিয়া কত দূর এখান থেকে?

দূর না। দশ মিনিটের পথ।

হাসান আলি বলল, দুইটার আগে পৌঁছাইয়া দিমু। ভূলেই গিয়েছিলাম যে হাসান আলির মতো এক জন করিৎকর্মী লোক আছে আমাদের সঙ্গে। সে নাকি যা বলে, তাই করে। প্রমাণ তো দেখতেই পাচ্ছি।

বাড়ির ভেতরে রান্নাবান্না শুরু হয়েছে, বুঝতে পারছি। চিকণ গলায় কে এক জন মেয়ে ঘনঘন ডাকছে–ও হালিমা, ও হালিমা। সেইসঙ্গে দমকা হাসির আওয়াজ। একটা উৎসব উৎসব ভাব। বেশ লাগছে।

সেরেছে! আনিস দেখি বমি করছে! ব্যাপার কি? চোখ হয়েছে টকটকে লাল। নিঃশ্বাস পড়ছে ঘনঘন। মরেটরে যাবে না তো আবার? দুক্তোরি, কি শুধু আজেবাজে কথা ভাবছি। বুঝতে পারছি, অতিরিক্ত পরিশ্রম আর মানসিক দুশ্চিন্তায় এ রকম হয়েছে। আজ রাতটা রেস্ট নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। একটি ছেলে পাখা করছে আনিসের মাথায়। খুব বাহারে পাখা দেখি! চারিদিকে রঙিন কাপড়ের ঝালর।

জাফরও শুয়েছে লম্বা হয়ে। জাফরের শোওয়া মানেই ঘুম। ঘুম তার সাধা, কোনোমতে বিছানায় মাথাটি রাখতে পারলেই হল। ভাত রান্না হতে-হাতে সে তার সেকেণ্ড রাউণ্ড ঘুম সেরে ফেলবে। ফার্স্ট রাউণ্ড তো নৌকাতেই সেরেছে। জাফরের ঘুম আবার সুরেলা। ফুরুৎফুরুৎ করে নাক ডাকবে। এই কথা বলেছিলাম বলে এক দিন কী রাগ। মারতে

আসে আমাকে। বেশ লোক দেখি তুমি। ফুরুৎ ফুরুৎ করে নাক ডাকতে পারবে, আর আমরা বলতেও পারব না? করলে দোষ নয়, বললে দোষ?

ঠিক আমার বাবার মতো। রাত-দিন কারণ্যে-অকারণে চেঁচাচ্ছেন, আর সেও কি চেঁচানি! রাস্তার মোড় থেকে শুনে লোকে খবর নিতে আসে বাসায় কী হয়েছে। মা এক দিন বিরক্ত হয়ে বললেন, কী রাত –দিন চেঁচাও! অমনি বাবার রাগ ধরে গেল। ঘাড়টাড় ফুলিয়ে বিকট চিৎকার, কী, আমি চেঁচাই?

মা সহজ সুরে বললেন, এখন কী করছ, চেঁচাচ্ছ না?

চুপ রাও। একদম চুপ।

বাবার কথা মনে হলেই এই হাসির কথাটা মনে পড়ে। এমন সব ছেলেমানুষী ছিল তাঁর মধ্যে। এক বার খেয়াল হল, আমাদের সবাইকে নিয়ে বেড়াতে যাবেন সীতাকুণ্ড তাঁর এক বন্ধুর বাড়ি। দুমাস ধরে চলল আয়োজন। বাবার ব্যস্ততার সীমা নেই। যাবার দিন এক ঘণ্টা আগে স্টেশনে নিয়ে গেলেন সবাইকে, আর সে কি চেচনি, এটা ফেলে এসেছি ওটা ফেলে এসেছি। টেন এল, সবাই উঠলাম। পাহাড়প্রমাণ মাল তোলা হল। একসময় টেন ছেড়ে দিল, দেখা গেল বাবা উঠতে পারেন নি। প্রাণপণে দৌড়াচ্ছেন। হাতের কাছে যে-কোনো একটা কামরায় উঠে পড়লেই হয়, না–তা উঠবেন না। আমরা যে কামরায় উঠেছি, ঠিক সে-কামরায় ওঠা চাই। এক সময় দেখলাম, বাবা হোঁচট খেয়ে পড়েছেন। হুস-হুস করে তাঁর চোখের সামনে দিয়ে টেন চলে যাচ্ছে। আচ্ছা, মৃত মানুষরা কি মানুষের মনের কথা টের পায়? যদি পায়, তা হলে বাবা নিশ্চয়ই আমি কী ভাবছি বুঝতে পারছেন? আচ্ছা ধরা যাক, একটি লোককে সবাই মিলে ফাঁসি দিচ্ছে–তাহলে সেই হতভাগ্য লোকটির চোখে-

মুখে কী ফুটে উঠবে? হতাশা, ঘৃণা, ভয়... আমা: মাথাটাই খারাপ হয়ে গেল নাকি? নয়তো এ রকম অর্থহীন চিন্তা কেউ করে? ও কি, আনিস আবার বমি করছে নাকি? জোর করে দুধটা না খাওয়ালেই হত!

মোক্তার সাহেব এসে চুপি চুপি কী বলছেন হুমায়ূন ভাইকে। কে জানে, এর মধ্যেই কী এমন গোপনীয় কথা তৈরী হয়েছে যা কানের কাছে মুখ নিয়ে বলতে হবে! আরে আরে, এই ব্যাপার! এটা আবার কানাকানি বলতে হবে নাকি? বলে হয়, ভাত দেয়া হয়েছে, খেতে আসেন। যত বেকুবের দল।

হাসান আলি বলল, তাড়াতাড়ি করেন, সময় নাই! মাতব্বর কোথাকার সময় নেই–সেটা তোর কাছে জানতে হবে নাকি?

খেতে বসে দেখি খিদে মরে গেছে। তরকারিতে লবণ হয়েছে বেশি হয়েছে, কাদার মতো নরম। চিবাতে হয় না, কোঁৎ কোৎ করে গিলে ফেলা যায়, ভালো হল না মোটেই! জাফর বলল, হুঁ নোজ, দিস মে বি আওয়ার লাস্ট মিল। কথায় কথায় ইংরেজি বলা জাফরের স্বভাব। তার ধরন ধারণাও ইংরেজের মলে এই মহা দুর্যোগেও ভোরবেলা উঠেই তার শেভ করা চাই। দুপুরে সাবান মে মেখে গোসল সারা চাই। দিনের মধ্যে দশ বার চিরুনির ব্যবহার হচ্ছে। রূপ যাদের আছে, তারাই রূপ-সচেতন হয়। এবং এত উলঙ্গভাবে হয়, যে বড়ো চোখে লাগে।

আমাদের পাশের বাড়ির রেহানা দশ–এগারো বছর বয়স পর্যন্ত কী চমৎকার মেয়েই না ছিল, কিন্তু যেই তার বয়স তেরো পেরিয়ে গেল, যেই সে বুঝল তার চোখ ধাঁধান রূপ

আছে, অমনি সে বদলে গেল। আহাদী ধরনের টেনে টেনে কথা বলা–ম-জি—দ ভা-ই, ঘন ঘন ভ্রূ কোঁচকান। জঘন্য, জঘন্য!

হুমায়ূন ভাই বোধহয় কোনো একটা রসিকতা করলেন। ভ্যাক ভ্যাক করে হাসছে সবাই। আমি অন্যমনস্ক ছিলাম বলে শুনতে পাই নি। এখন সবাই হাসছে, আমি মুখ কালো করে বসে আছি। নিশ্চয়ই বোকা— বোকা লাগছে আমাকে। কে জানে, রসিকতাটা হয়তো আমাকে নিয়েই। সবাই যে-ভাবে তাকাচ্ছে আমার দিকে, তাতে তাই মনে হয়। ও কি, হাসান আলিও হাসছে দেখি।

হাসো বাবা, হাসো। যত ইচ্ছে হাস। কিছুক্ষণ পরই যখন বমবাম করে মটারের শেল ভাঙা শুরু হবে, তখন এত রস আর থাকবে না। কাজেই এই-ই হচ্ছে গোল্ডেন আওয়ার।

পান আনব। পান খাবেন?

জিজ্ঞেস করল কে যেন। আমি মাথা নাড়লাম। পানটান লাগবে না রে বাবা। বিনা পানেই চলবে। মুড নেই। পান, সিগারেট, চা–এসব হচ্ছে মুডের ব্যাপার; মুড না থাকলে বিষের মতো লাগে।

হুমায়ূন ভাই বললেন, আমরা রওনা হচ্ছি। আনিস, তুমি থাক। ফেরবার পথে তোমাকে নিয়ে যাব। তিনি তাহলে ফেরবার চিন্তাও করছেন! ভুলে গেছেন নাকি, মেথিকান্দা মুক্তিবাহিনীর মৃত্যুকূপ। আজ যাত্রা থেকেই অলক্ষণ শুরু হয়েছে। নৌকাও ছাড়ল, বৃষ্টিও নামল। হুমায়ূন ভাই একটা প্রচণ্ড উপকাঁপাত দেখলেন। আনিস হয়ে পড়ল অসুস্থ। শেষটায় কী হবে কে জানে?

বড়ো অস্থির লাগছে। ইয়া মুকাদেমু, ইয়া মুকাদেমু, ইয়া মুকাদেমু-কে যেন বলেছিল যুদ্ধের সময় এই হচ্ছে সবচেয়ে ভালো দোওয়া–যার অর্থ হে অগ্রসরকারী। এই তোয়া পড়ে শুধু এগিয়ে যাওয়া!

না, বড়ো খারাপ লাগছে। ভালোয় ভালোয় ফিরে এলে আর যাব না। সম্ভব হলে ফিরে যাব মৈমনসিংহ। কিন্তু গিয়ে করবটা কী? মা কোথায় আছেন কে জানে? বাবা বেচারা মরে বেচেছেন। কোনো দায়দায়িত্ব নেই। কিন্তু আমিই—বা কোন দায়িত্ববান সুপুত্রটি? বাবাকে ধরে নিয়ে গেল মিলিটারি, আমিও এলাম পালিয়ে, অথচ নিশ্চিত জানি মায়ের কোনো সহায়-সম্বল নেই। বোনগুলি বোকার বেহদ। ফিরে গিয়ে হয়তো দেখব অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ণ ফ্রন্ট। কেউ নেই, সব সাফ হয়ে গেছে। মন্দ হয় না খুব। বাঁধা-বন্ধনহীন বল্লাহারা জীবন। কী আনন্দ!

অবশ্যি এমনও হতে পারে দেশ স্বাধীন হবে। আমি মৈমনসিংহ ফিরে যাব। বাবাকে হয়তো তারা প্রাণে মাঠে নি। তিনি জেল থেকে বেরিয়ে আসবেন! আবার আমরা সীতাকুণ্ড যাব। পাহাড়প্রমাণ জিনিসপত্র তোলা হবে ট্রেনে। একসময় ট্রেন ছেড়ে দেবে, দেখব বাবা প্রাণপণে দৌড়াচ্ছেন। আহ, চোখে জল আসে কেন?

মোক্তার সাহেব, দোওয়া রাখবেন। খোদা হাফেজ, আনিস।

খোদা হাফেজ। খোদা হাফেজ।

আনিস সাবেত

আমার মন বলছে আজকের যুদ্ধে হুমায়ূন ভাই মারা যাবেন। নৌকার ছাদে বসে তিনি যখন আপন মনে গুনগুন করছিলেন, তখনি আমার এ কথাটা মনে হয়েছে। কিছুক্ষণ পর তিনি নেমে এসে বললেন, অনেকগুলি উপকাঁপাত হল। একটা তো প্রকাণ্ড। তখনি আমি নিশ্চিত হয়েছি। আমার মনের মধ্যে যে-কথাটি ওঠে, তাই সত্যি হয়। এ আমি অনেক বার দেখেছি।

সেবার স্বরূপহাটির রেলওয়ে কালভার্ট ওড়াতে গিয়েছি।–আমি, রহমান আর ওয়াহেদ। রহমানের আবার খুব চায়ের নেশা। খুঁজে-খুঁজে চায়ের দোকানও একটা বের করেছে। বিস্বাদ তেতো চা–তাতে চুমুক দিয়ে রহমান চেচিয়ে উঠল, ফার্স্ট ক্লাস চা। আর তখনি কেন জানি আমার মনে হল, রহমানের কিছু-একটা হবে। হলও তাই। হুমায়ুন ভাইয়ের বেলাও কি তাই হবে?

হুমায়ূন ভাইয়ের ঢাকার বাসার ঠিকানা আছে আমার কাছে) ১০/৭ বাবর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-৭। দোতলায় থাকেন তাঁর খাবা-মা। যদি সত্যি কিছু হয়, তাহলে এই ঠিকানায় খবর দিতে আমি নিজেই যাব। তাঁর মা নিশ্চয়ই জানতে চাইবেন তাঁর ছেলে কী ভাবে থাকত, কী করত। সব বলব আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। তাঁরা হয়তো ছেলে কোথায় মারা গেছে, দেখতে চাইবেন। আমি নিজেই তাঁদের নিয়ে আসব। আমরা আজ যে-পথে এসেছি, সেই পথেই আনিব। বলব, রাতটা ছিল অন্ধকার। নক্ষত্রের আলোয় আলোয় এসেছি। পথে মোক্তার সাহেবের বাড়িতে ভাত খেয়েছি। হুমায়ূন ভাইয়ের মা হয়তো মোক্তার সাহেবকে

দেখতে চাহবেন। মোক্তার সাহেবকে হয়তো তিনি বলবেন, আপনি আমার ছেলেকে শেষ বারের মতো ভাত খাইয়েছেন। আল্লাহ। আপনার মঙ্গল করুক।

ক্যান কান্দেন?

আমাকে যে-ছেলেটি বাতাস করছিল, সে অবাক হয়ে আমার কাঁদবার কারণ জানতে চাইছে। ইচ্ছে করে কি আর কাঁদছি? হঠাৎ চোখে জল এল।

মাথার মধ্যে পানি দিবেন। একটু?

না।

মাথাটা টিপা দিমু?

না-না।

সে দেখি আমার সেবা না-করে ছাড়বে না। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। কিন্তু আমার সহ্য হচ্ছে না। আমি তো দিব্যি আরাম করে শুয়ে আছি। আর ওরা নিশ্চয়ই কাদা ভেঙে দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে। রামদিয়া থেকে আরো দু মাইল উত্তরে মেথিকান্দা। সেখানে তারা হাঁটা-পথে যাবে, না কায় ?

টুনু মিয়ার দলে মোট কত জন ছেলে আছে ? হুমায়ুন ভাই এক বার বলেছিলেন, কিন্তু এখন দেখি ভুলে বসে আছি। ওদের সাথে দু ইঞ্চি মর্টারও আছে। মেথিকান্দা আজ নিশ্চয়ই দখল হবে। সুজনতালির রেলওয়ে পুলও উড়িয়ে দেওয়া হবে। সমস্ত অঞ্চলটা বিচ্ছিন্ন করে

দিয়ে স্বাধীন বাংলার ফ্ল্যাগ উড়িয়ে দেব। ফাইন। কে জানে, এত গোলমালে কেউ কি আর জাতীয় পতাকার কথাটা মনে রাখবে? স্থানীয় লোকজনের কাছে নিশ্চয়ই স্বাধীন বাংলার ফ্ল্যাগ পাওয়া যাবে। আগে তো ঘরে ঘরে ছিল। মিলিটারি আসবার পর সবাই হয় পুড়িয়ে ফেলেছে, নয়তো এমন জায়গায় লুকিয়েছে যে ইদুরে খেয়ে গিয়েছে। এমন দিনে একটা ঝকঝকে নতুন ফ্ল্যাগ চাই।

এত দিন শুধু ছোটখাটো হামলা করেছি। বিভিন্ন থানায় ছোটখাটো খণ্ডযুদ্ধের পর রাতারাতি সরে এসেছি নিরাপদ স্থানে। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ব্যতিব্যস্ত করে রাখা। মুহুর্তের জন্যেও যেন শান্তির ঘুম না দিতে পারে। কিন্তু আজকের ব্যাপার অন্য। আজ আমরা খুটি গেড়ে বসব। আহা, আবার চোখে জল আসে। কেন?

পর্দার আড়াল থেকে সুশ্রী একটি মেয়ে উঁকি দিয়ে আমায় দেখে গেল। বেশ মেয়েটি। ইচ্ছে হচ্ছিল ডেকে কথা বলি। কিন্তু ইচ্ছাটা গিলে ফেলতে হল। এ বাড়িতে কিছু সময় থাকতে হবে আমাকে। এ সময় এমন কিছু করা উচিত নয়, যাতে এ বাড়ির লোকজন বিরক্ত হয়।

স্লামালিকুম।

অলায়কুম সালাম।

আমি গনি মিয়ার চাচাত ভাই। উত্তরের বাড়িতে থাকি। মিয়া সাহেবের শরীলডা এখন কেমুন?

ভালো।

শুধু গনি মিয়ার চাচাত ভাই-ই নয়, আরো অনেকেই জড়ো হয়েছে। সম্ভবত আরো লোকজন আসছে। আমার বিরক্ত লাগছে, আবার ভালোও লাগছে। বিরক্ত লাগছে কথা বলতে হচ্ছে বলে, ভালো লাগছে লোকজনদের কৌতূহলী চোখ দেখে। তোমরা তাহলে শেষ পর্যন্ত কৌতূহলী হয়েছ? দেখতে এসেছ মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের? বেশ বেশি।

ইস, কী দিনই না গিয়েছে। শুরুতে। গ্রামবাসী দল বেঁধে মুক্তিবাহিনী তাড়া করেছে, এমন ঘটনাও ঘটেছে। অবশ্যি তাদেরই—বা দোষ দিই কী করে? মিলিটারি রয়েছে ওৎ পেতে। যেই শুনেছে অমুক গ্রামে মুক্তিবাহিনী ঘোরাফেরা করছে, হুকুম হল–দাও ঐ গ্রাম জ্বালিয়ে। যেই শুনেছে অমুক লোকের বাড়ি মুক্তিবাহিনী এক রাত্রি ছিল, অমনি হুকুম হল, অমুক লোককে গুলী করে মারি গ্রামের মধ্যিখানে, যাতে সবার শিক্ষা হয়। আহ, শুরুতে বড়ো কষ্টের দিন গিয়েছে।

কয়টা বাজে এখন? আমার কাছে ঘড়ি নেই। সময়টা জানা থাকলে হত। বুঝতে পারতাম। কখন গুলীর আওয়াজ পাব। অবশ্যি প্রথম শুনব ব্রীজ উড়িয়ে দেবার বিকট আওয়াজ। ব্রীজটা ওড়াতে পারবে তো ঠিকমতো? শুনেছি রেঞ্জাররা পাহারা দেয়। সারা রাত। খুব অস্থির লাগছে। ওদের সঙ্গে গেলেই হত। না-হয় একটু দূরে বসে থাকতাম। রেসের ঘোড়ার মতো হল দেখি। রেসের ঘোড়া বুড়ো হয়ে গেলে শুনেছি। অর্ধ-উম্মাদ হয়ে যায়। রেস শুরু হলে পাগলের মতো পা নাচায়।

আপনার জন্যে দুধ আনব এক গ্লাস?

সেই সুশ্রী মেয়েটি ঘরের ভেতর ঢুকেছে দেখে অবাক লাগছে। গ্রামঘরের বাড়িতে এ-রকম তো হয় না। বেশ কঠিন পর্দার ব্যাপার থাকে। আমার খানিকটা অস্বস্তি লাগছে। গনি মিয়ার ভাই, যিনি আমার বিছানার পাশে বসেছিলেন, তিনিও আমার অস্বস্তি লক্ষ্য করলেন।

মেয়েটি আবার বলল, আনব আপনার জন্যে এক গ্লাস দুধ?

না-না, দুধ লাগবে না।

খান, ভালো লাগবে। আনি?

আন।

গনি মিয়ার চাচাত ভাই বললেন, বড়ো ভালো মেয়ে। শহরে পড়ে।

কী পড়ে?

বি... এ... পড়ে। হোস্টেলে থাকে।

শুনে আমি অপ্রস্তুত। তুমি তুমি করে বলছি, কী কাণ্ড! কামিজ পরে আছে বলেই বোধহয় এত বাচ্চা দেখা যায়। তাছাড়া তার হাবভাবও ছেলেমানুষী।

মেয়েটি মোক্তার সাহেবের বড়ো ভাইয়ের মেয়ে। বড়ো ভাই ও ভাবী দু জনেই মেয়েটিকে ছোট রেখে মারা গেছেন। মেয়েটি মোক্তার সাহেবের কাছেই বড়ো হয়েছে। পড়াশোনার

খুব ঝোঁক, ঢাকায় হোস্টেলে থেকে পড়ে। গণ্ডগোলের আভাস পেয়ে আগেভাগেই চলে এসেছিল।

মেয়েটি দুধের গ্লাস আমার সামনের টেবিলে নামিয়ে রাখল না, হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমি বললাম, তোমার নাম?

হামিদ। হামিদা বানু।

আমি চুপ করে রইলাম। কী বলব ভেবে পেলাম না! অথচ মেয়েটি দাঁড়িয়েই আছে। হয়তো কিছু কথা শুনতে চায়। যুদ্ধের গল্প শুনতে মেয়েদের খুব আগ্রহ। হামিদা একসময় বলল, আমার নামটা খুব বাজে! একেবারে চাষা-চাষা নাম।

আমি বললাম, নাম দিয়ে কী হয়?

হয় না। আবার, আমার বন্ধুদের কী সুন্দর সুন্দর নাম! এক জনের নাম কিন্নরী, এক জনের নাম স্বাতী।

মোক্তার সাহেব বললেন, আপনার জন্যে ডাক্তার আনতে লোক গেছে। ভালো ডাক্তার–এল. এম. এফ.। হামিদা আম্মাজি, ভেতরে যান।

বাহ্! কী সুন্দর আম্মাজি ডাকছে। মেয়েটি বোধহয় সবার খুব আদরের। মোক্তার সাহেবের কথায় সে ঘাড় ঘুরিয়ে হাসল। আমাকে দেখতে-আসা লোকগুলি চলে যাচ্ছে একে একে।

এত তাড়াতাড়ি কৌতূহল মিটে গেল? মোক্তার সাহেব অবশ্যি লোকজনদের ঝামেলা না করবার জন্যে বলছেন। তবুও তাদের আগ্রহ এত কম হবে কোন?

অন্দরমহলের ফিসফিসানি শোনা যাচ্ছে। পর্দার ওপাশে জটলা-পাকান মেয়েদের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। হামিদা বলল, ওরা আপনাকে দেখতে চায়। মুক্তিবাহিনী কোনো দিন তো দেখে নাই।

তুমি দেখেছি নাকি?

এই তো আপনাকে দেখলাম।

বাহ, বেশ মেয়ে তো! বেশ গুছিয়ে কথা বলে। ইউনিভার্সিটিতে আমাদের সঙ্গে পড়ত।–শেলী রহমান। সেও এরকম গুছিয়ে কথা বলত–একেক বার আমাদের হাসিয়ে মারত। শেলী রহমানের বাবা তো পুলিশ অফিসার ছিলেন, মিলিটারির হাতে মারা যান নি তো।

কয় ভাইবোন আপনারা?

আমি একা। ভাইবোন নেই কোনো।

ভাইবোন না থাকা খুব বাজে।

এ কী! গুলীর আওয়াজ শুনলাম না? তাহলে কি শুরু হল নাকি? তিনটে বেজে গেছে। এর মধ্যে। আমি ছটফট করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম, কয়টা বাজে হামিদা, একটু জেনে

আসবে? মোক্তার সাহেব বললেন, দুটো পাঁচশ। কী আশ্চর্য, এখনো তো যুদ্ধ শুরুর সময় হয় নি।

হামিদা বলল, কী হয়েছে?

গুলীর আওয়াজ শুনলাম।

কই না, না তো!

আমি তো শুনলাম নিজ কানে।

মোক্তার সাহেব বললেন, না, গুলীর আওয়াজ নয়। গুলীর আওয়াজ হলে বুঝতাম। কত বার যুদ্ধ হল এখানে।

মেথিকান্দার আশেপাশে যারা থাকে, গুলীর শব্দ তারা অনেক বারই শুনেছে। অনেক বার ব্যর্থ আক্রমণ হয়েছে এখানে। কিন্তু কেউ মুক্তিবাহিনী দেখে নি, এটা কেমন কথা। হয়তো সবাই বিল পার হয়ে ছোট খাল ধরে এগিয়েছে। আমাদের মতো গ্রামের ভিতর দিয়ে রওনা হয় নি। যাই হোক, এ নিয়ে ভাবতে ভালো লাগছে। না। বমি-বমি লাগছে। মাথাটা এমন ফাঁকা লাগছে কেন। বীজটা ঠিকমতো ওড়াতে পারবে তো? এমন যদি হত, সবাই ঠিকঠাক ফিরে এসেছে, কারো গায়ে আচড়টি লাগে নি। তা কি আর হবে? কি একটা গান আছে না। সুবীর সেনের–মন নিতে হলে মনের মূল্য চাই। ও কি, মাথা ঘুরছে নকি?

আপনার কী হয়েছে, এ রকম করছেন কেন?

কিছু হয় নি। এই তো, এই তো গুলীর শব্দ পাচ্ছি। হামিদা, যুদ্ধ শুরু হল।

বাতাসে জানালা নড়ার শব্দ শুনছেন–

মর্টারের শেল ফাটার আওয়াজ পাচ্ছি না?

আপনি চুপ করে শুয়ে থাকুন। মাথায় পানি দিই?

মেয়েটির মাথা নিচু হয়ে এসেছে। কিন্নরী না নাম? উঁহু, হামিদা। তাহলে কিন্নরী নাম কার? বেশ সুশ্রী মেয়েটি। গলাটি কী লম্বা! ফর্সা, হাঁসের মতো। ঐ তো, আবার শেল ফাটার আওয়াজ। আহি পুরোদমে ফাইট চলছে।

আপনি নড়াচড়া করবেন না। চুপ করে শুয়ে থাকুন।

অনেক অপরিচিত মহিলা ঘরের ভেতরে ভিড় করছেন। মোক্তার সাহেবকে দেখছি না তো। মোক্তার সাহেব কোথায়? এই দাড়িওয়ালা লোকটি কে?

রামদিয়ার ঘাটে তারা যখন পৌঁছল, তখন আকাশ আবার মেঘাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। গুড়গুড় করে মেঘ ডাকছে, বিজলি চমকাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। দমকা বাতাসে শো শো শব্দ উঠছে বাশবনে। হুমায়ূন পিছিয়ে পড়েছিল। হোঁচটি খেয়ে তার পা মচকে গিয়েছে। সে হাঁটছে খুঁড়িয়ে-খুড়িয়ে। জাফর গলা উঁচিয়ে ডাকল, হুমায়ূন ব্রাদার, হুমায়ূন ব্রাদার।

তার ডাকার ভঙ্গিটা ফুর্তিবাজের ভঙ্গি। সব সময় এ-রকম থাকে না। মাঝেমধ্যে আসে। হুমায়ূন হাসল মনে মনে। সেও খুব তরল গলায় সাড়া দিল, কী ব্যাপার জাফর?

বৃষ্টি আতা হায়। বহুত মজাকা বাত।

বলতে-বলতেই টুপটুপ করে বিচ্ছিন্নভাবে বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে লাগল। জাফর হেসে উঠল হো-হো করে। যেন এ সময় বৃষ্টি আসাটা খুব একটা আনন্দের ব্যাপার।

হাসান আলি মাথার বাক্স নামিয়ে তার উপর বসে ছিল–যদিও বেশ বেগে হাওয়া বইছে, তবু সে লাল গামছা দুলিয়ে নিজেকে হাওয়া করছিল। বৃষ্টি আসতে দেখে সেও কী মনে করে যেন হাসল।

মজিদ একটা সিগারেট ধরিয়েছে। ফুস-ফুস করে ধোঁয়া ছাড়ছে। সে বড়ো ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এখানে দাঁড়িয়ে তার ক্লান্তি আরো বেড়ে গেল। বিরক্ত হয়ে বলল, কী ব্যাপার হাসান আলি, টুনু মিয়ার দল কোথায়?

হাসান আলি সে কথার জবাব দিল না, গামছা দুলিয়ে হাওয়া করতেই লাগল। মজিদ গলা উঁচিয়ে বলল, কথা বলছি না যে, কী ব্যাপোর?

নৌকা আসতাছে। বিশ্রাম করেন মজিদ ভাই।

হুমায়ূন ও জাফর এসে বসল হাসান আলির পাশে। বৃষ্টি নামতে-নামতে আবার থেমে গেছে। বসে থাকতে মন্দ লাগছে না। তাদের। রামদিয়ার ঘাটে টুনুমিয়ার দলকে না দেখতে

পেয়ে তারা সে-রকম অবাক হল না। জাফর হঠাৎ সুর করে বলল, ওগো ভাবীজান, মর্দ লোকের কাম।

তারা সবাই মিনিট দশেক বসে রইল। চারিদিকে ঘন অন্ধকারে মাঝে মাঝে সিগারেটের ফুলকি আগুন জ্বলছে-নিভিছে। ঝিঝি পোকার একটানা বিরক্তিকর আওয়াজ ছাড়া অন্য আওয়াজ নেই। হাসান আলি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, নৌকা দেখা যায়। উঠেন, সবেই উঠেন।

দেশী ডিঙ্গি নৌক ঠেলে উজানে নিয়ে আসছে।

হাসান আলি উঁচু গলায় সাড়া দিল, হই হই হই-হা।

নৌকা থেকে এক জন চেঁচিয়ে উঠল, হাসান ভাই নাকি গো? ও হাসান ভাই।

কী।

ঠিকমতো পৌঁছছেন দেহি।

হাসান আলি আচমকা প্রগলভ হয়ে উঠল। নৌকা পাড়ে ভিড়তেই নৌকার দড়ি ধরে শিশুর মতো চেঁচিয়ে উঠল, টুনু মিয়া, ও টুলু মিয়া?

নৌকার ভেতর থেকে একসঙ্গে উঁচু স্বরগ্রামে হেসে উঠল সবাই। টুনু মিয়া লাফিয়ে নামল নৌকা থেকে, বেঁটেখাট মানুষ। পেটা শরীর, মাথার চুল ছোট-ছোট করে কাটা। সে হাসিমুখে এগিয়ে গেল হুমায়ূনের দিকে।

আমারে চিনছেন কমাণ্ডার সাব? আমি টুনু। বাজিতপুরের টুনু মিয়া। বাজিতপুর থানায় আপনার সাথে ফাইট দিছি।

হুমায়ূন বলল, তোমরা দেরি করে ফেলেছ, আড়াইটা বাজে।

আগে কন আমারে চিনছেন কিনা।

চিনেছি, চিনেছি। চিনব না কেন?

বাজিতপুর ফাইটে আমার বাম উড়াতে গুলী লাগল। আপনে আমারে পিঠে লইয়া দৌড় দিলেন। মনে নাই আপনার?

খুব মনে আছে।

বাঁচনের আশা আছিল না। আপনে বাঁচাইছেন। ঠিক কইরা কন, আমারে চিনছেন? সেই সময় আমার লম্বা চুল আছিল।

হুমায়ূন অবশ্যি সত্যি চিনতে পারে নি, তবু আজকের এই মধ্যরাতে স্বাস্থ্যবান হাসি-খুশি এই তরুণটিকে অচেনা মনে হল না। দলের অন্যান্য সবাই নেমে এসেছে। হাসান আলি তাদেরকে কী যেন বলছে, আর তারা ক্ষণে ক্ষণে হেসে উঠছে। কে বলবে এই সব ছেলেদের জীবন-মৃত্যুর সীমারেখা কিছুক্ষণের মধ্যেই সম্পূর্ণ মুছে যাবে।

জাফর বলল, আর লোকজন কোথায়?

আছে, জায়গা মতোই আছে।

তাহলে আর দেরি কেন? নৌকা ছাড়া যাক। হুমায়ূন ভাই কী বলেন?

হ্যাঁ হ্যাঁ, উঠে পড় সবাই।

নৌকায় উঠে বসতেই বড়ো বড়ো ফোটায় বৃষ্টি নামল। নৌকা যদিও ভাটির দিকে যাচ্ছে, তবু বাতাসের ঝাপটায় এগোচ্ছে ধীর গতিতে, মাঝে মাঝে তীরে গজিয়ে-ওঠা বেতঝোপে আটকে যাচ্ছে। যত বারই নৌকা আটকে যাচ্ছে, তত বারই মাঝি দুটি গাল পাড়ছে, ও হালার পুত, ও হারামীর বাচ্চা। গ্রামের ভেতর দিয়ে নৌকা যাবার সময় মেঘ ধরে গেল। তীরে বৃষ্টি অগ্রাহ্য করে অনেক কৌতূহলী লোক বসে আছে। দু-এক জন সাহস করে নিচু গলায় বলছে, জয় বাংলা।

মুক্তিবাহিনী চলাচল হচ্ছে এ খবর কী করে পেল কে জানে!, হুমায়ূন একটু বিরক্ত হল। মুখে কিছুই বলল না। অবশ্য ভয় পাবার তেমন কিছু নেইও। মিলিটারিরা কিছুতেই এই রাত্রিতে থানার নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে বাইরে বেরুবে না। মজিদ বলল, হুমায়ূন ভাই, পজিশন নেব কোথায়? সব খানাখন্দ তো পানিতে ভর্তি। সাপখোপও আছে কিনা কে জানে।

নৌকার অনেকেই এই কথায় হেসে উঠল! মজিদ রেগে গিয়ে বলল, হাস কেন? ও মিয়ারা, হাস কেন? মজিদ রেগে যাওয়াতেই হাসিটা হঠাৎ করেই থেমে গেল। নৌকা নীরব হল

মুহূর্তেই। তখনি শোনা গেল, বাইরে ঝুপরূপ করে বৃষ্টি হচ্ছে। মাঝি দু জন ভিজে চুপসে গেছে। জাফর বলল, মাঝিরা তো দেখি গোসল সেরে ফেলেছে।

হ গো ভাই, তিন দফা গোসল হইল।

জাফর সুর করে বলল, বাইচ বাইতে মর্দ লোকের কাম।

মজিদ ক্রমাগতই বিরক্ত হচ্ছিল। ভয় করছিল তার। ভয় কাটোনর জন্যেই জিজ্ঞেস করল, মর্টার কোথায় ফিট করেছ তোমরা? থানা কত দূর?

গোঁসাই পাড়ায়। বেশি দূর না। পরথমে সেইখানে যাইবেন?

না-না, যাওয়ার দরকার কী? তাদের কাজ তারা করবে। হুমায়ূন ভাই কী বলেন?

হুমায়ূন কিছু বলল না, চুপ করে রইল। তার মচকে-যাওয়া পা ব্যথা করছিল। সে মুখ কুচকে বসে রইল। তীর থেকে কে এক জন চেঁচিয়ে ডাকল, কার নাও? কার নাও?

নৌকার মাঝি রসিকতা করল, হেঁড়ে গলায় বলল, তোমার নাও।

নাও ভিড়াও মাঝি, খবর আছে, নাও ভিড়াও।

নৌকা ভিড়ল না, চলতেই থাকল এবং কিছুক্ষণ পরেই তীব্র টর্চের আলো এসে পড়ল নৌকায়।

নৌকা ভিড়াও মাঝি, সামনে রাজাকার আছে।

কোনখানে?

শেখ জানির খালের পারে বইসা আছে।

থাকুক বইসা, তুমি কেডা গো?

আমি শেখজানি হাইস্কুলের হেড-মাস্টার আজিজুদ্দিন। মুক্তিবাহিনীর নাও নাকি?

মনে অয় হেই রকমই।

নৌকা ভিড়ল না, কারণ নৌকা শেখজনির খালে যাচ্ছে না। আজিজদ্দিন মাস্টার হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এই মাঝরাত্রে সে ছয় ব্যাটারির টর্চ হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন কে জানে?

এখান থেকেই গ্রামের চেহারাটা বদলাতে শুরু করেছে। দুটি আস্ত বাড়ি, তার পরপরই চারটি পুড়ে-যাওয়া বাড়ি। আবার একটা গোটা বাড়ি নজরে আসছে, আবার ধ্বংসস্তুপ। মিলিটারিরা প্রায় নিয়মিত আসছে। এদিকে। লোকজন পালিয়ে গেছে। ফসল বোনা হয় নি। চারিদিক জনশূন্য। নৌকা যতই এগিয়ে যায়, ধ্বংসলীলার ভয়াবহতা ততই বেড়ে ওঠে। আর এগোন ঠিক নয়। রাজাকারদের ছোটখাট দল প্রায়ই নদীর তীর ঘেঁষে ঘুরে বেড়ায়! নজর রাখে রাতদুপুরে কোনো রহস্যজনক নৌকা চলাচল করছে কিনা। তাদের

মুখোমুখি পড়ে গেলে তেমন ভয়ের কিছু নেই। তবে আগেভাগেই গোলাগুলীর শব্দে চারিদিক সচকিত করে লাভ কী?

রুস্তম ভাই, এই রুস্তম ভাই।

কেন্ডা গো?

আমি চান্দু, পাঞ্জাবী মিলিটারি, হিহিহি। নৌকা থামান।

নৌকার গতি থেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে। একটি ছোটখাট রোগা মানুষ লাফিয়ে উঠল। নৌকায়। জাফর বলল, কী ব্যাপার, কী চাও তুমি? কে তুমি?

আমি কেউ না, চান্দু!

কী কর তুমি?

আমি খবরদারী করি। আপনেরার সাথে যামু। যা করবার কন করুম।

রুস্তম বলল, চান্দুরে লন সাথে, খুব কামের ছেলে। গ্রেনেড নিয়া একেবারে থানার ভিতরে ফালাইব দেখবেন।

চান্দু গম্ভীর হয়ে বলল, নামেন গো ভালোমানুষের পুলারা। জিনিসপত্র যা আছে, আমার মাথায় দেন। পিনপিনে বৃষ্টি মাথায় করে দলটি নেমে পড়ল। সবে মাটিতে পা দিয়েছে, অমনি দূরাগত বিকট আওয়াজ কানে এল। কী হল, কী হল। দল দাঁড়িয়ে পড়ল। হঠাৎ।

মজিদ উৎকণ্ঠিত স্বর বের করল, হুমায়ূন ভাই, কী ব্যাপার? উত্তর দিল চান্দু, কিছু না। পুল ফাটাইয়া দিছে। সাবাস, ব্যাটা বাপের পুত।

তা হলে ব্রীজ উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আহ কি আনন্দ! ভয় কমে যাচ্ছে সবার। সবাই দাঁড়িয়ে থাকল। কিছুক্ষণ। বিকট শব্দটা হম হম করে প্রতিধ্বনি তুলল। থানার হলুদ রঙের দালানটি দেখা যাচ্ছে। রঙ দেখা যাচ্ছে না। কাঠামোটা স্পষ্ট নজরে আসছে। থানার আশেপাশে দু, শ গজের মতো জায়গা পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে। ঘরবাড়ি নেই, গাছপালা নেই।–খাঁ-খাঁ করছে। অনেক দূর থেকে যাতে শত্রুর আগমন টের পাওয়া যায়, সেই জন্যেই এই ব্যবস্থা।

তিনটি দলে ভাগ হয়ে অপেক্ষা করছে ছেলেরা। এদেরও অনেক পেছনে আধইঞ্চি মর্টার নিয়ে অপেক্ষা করছে একটি ছোট্ট দল, যে-দলে পেনসনভোগী এক জন বৃদ্ধ সুবাদার আছেন। পুরনো লোক। তার উপর বিশ্বাস করা চলে। উত্তর দিকের ঢালু অঞ্চলটায় রুস্তম একাই আট হয়ে বসেছে। মাটি হয়েছে। পিছল। এল. এম. জি.র পা পিছলে আসে। কিন্তু সে সব এখন না ভাবলেও চলে।

চান্দু বসে আছে জাফরের পাশে। তার ইচ্ছে–বুকে হেঁটে থানার সামনে যে— দুটি বাঙ্কার, সেখানে গ্রেনেড ছুঁড়ে আসে। এ কাজ নাকি সে আগেও করেছে। জাফর কান দিচ্ছে না। তার কথায়।

বৃষ্টি থেমে গিয়ে আকাশ আবার পরিষ্কার হয়েছে। তারা দেখা যাচ্ছে। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে হুঁ-হু করে। ঘণ্টা দু য়েকের ভেতর অন্ধকার কেটে গিয়ে আকাশ ফর্সা হবে। শুরু হবে আরেকটি সূর্যের দিন।

কর্দমাক্ত ভেজা জমি। চারপাশের গাঢ় অন্ধকার, ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা–এর মধ্যেই নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে সবাই। কেমন যেন অদ্ভুত লাগে। রুস্তম ফিসফিস করে বলে, পায়ের উপর দিয়ে কী গেল, সাপ নাকি? ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগল। তার কণ্ঠস্বর অন্য রকম শোনায়। কেউ কোনো জবাব দেয় না। সবাই অপেক্ষা করে সেই মুহূর্তটির জন্যে, যখন মনে হবে পৃথিবীতে আমি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। রাইফেলের উপর ঝুঁকে থাকা একেকটি শরীর আবেগে ও উত্তেজনায় কাঁপতে থাকবে থরথর করে।